ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 19, No. 2, December 2022

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 19, No. 2, December 2022

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya
Eminent Author & Ex-Vice Chancelor, Assam University

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari
Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা
শ্রীবাস বিশ্বাস 3

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' ঃ শ্রেণিচেতনার অন্তরালে নিম্নবর্গের মানুষ
অর্ঘ্য হালদার 13

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প : যুগ ও জীবনের জলছবি
কৃষ্ণা ঝুল্কী 21

হাংরি কবিতার বিষয় ঃ একটি পর্যালোচনা
শিউলি বসাক 28

শবরচরিত : নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য
চঞ্চল মণ্ডল 40

I'm Not a Bisexual; I'm a Gay as a Goose: Memory, Discourse and Paralogy in Dattani's Mango Soufflé
Manodip Chakraborty 45

Defence and Strategic Studies in Colleges and Universities : Academic Indispensability
Subrata Ray 51

A Study on National Education Policy 2020 : Future Education System
Aniruddha Saha & Ratna Garai 62

OPEN EYES

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা

শ্রীবাস বিশ্বাস

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালির জীবনে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি একদিন হয়ে উঠেছিলেন মহামানব শ্রীচৈতন্যদেব। তবে কোনো গ্রন্থ রচনা বা কোনো সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি দ্বারা নয়। কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্তনকে হাতিয়ার করে প্রেমের দ্বারা তিনি সব মানুষকে একসাথে মিলিয়ে দিলেন। উঠে গেল সব রকম বাধা ব্যবধান। মানুষ দেবতাকে প্রিয় করলো আর প্রিয়ই হল দেবতা। এই মহামানবের প্রভাব পড়েছে সাহিত্যের প্রতিটি ধারায়। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকার ধারায়ও উঠে এসেছে চৈতন্যদেবের কথা, তাঁর প্রেমধর্মের কথা, পার্ষদদের কথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কথা, কখনও বা বৈষ্ণব সমাজের বাইরের কথা। মোটকথা পত্রিকাগুলিতে চৈতন্যদেবকে নিয়ে নানাভাবে চর্চা করা হয়েছে। এর মধ্যে যারা বৈষ্ণব ভাবাবেগে আপ্লুত তাদের মধ্যে অনেক সময় নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যায়। আর যারা বাইরের বৃত্তের মানুষ তাদের মধ্যে ভক্তি বিহ্বলতার পরিবর্তে বিচারশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য বিশ শতকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির বেশ কয়েকটিতে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যাব্দ, কোথাও বা বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলত আমরা যখন সব জায়গায় খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করেছি তখন দু-এক জায়গায় পত্রিকা প্রকাশের কাল একবছর আগে বা পরে হওয়ার সংশয় থেকে গেছে। সে সবের কোনো বিতর্কে না গিয়ে বিশ শতকের প্রথম দুই শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় কীভাবে চৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্চা হয়েছে আমরা সে বিষয়েই আলোকপাত করবো।

শিশিরকুমার ঘোষের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় যার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্রীপ্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী ও ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত। পত্রিকাটি প্রথমে পাক্ষিক ছিল, পরে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণবধর্মের চর্চা ও প্রচার করা। তবে চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগ করার পর বিষ্ণুপ্রিয়া আজীবন মহাপ্রভুর ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। ফলত তাঁর (বিষ্ণুপ্রিয়ার) নামাঙ্কিত পত্রিকাটির চিন্তা-চেতনা চৈতন্যচর্চারই নামান্তর।

'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র (১৮৯০ খ্রি.) ১ম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নাম হয় 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'। গৌরাঙ্গের প্রেম-ভাবনা এবং রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা প্রকাশে পত্রিকাটি যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকাটির গুরুত্ব অনুভব করে বলেছেন—

> ''শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা শিশিরকুমারের গৌরাঙ্গ আন্দোলনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ... ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব হ্রাস করে শিক্ষিত বৈষ্ণব বিরোধী অনেক মানুষকে বৈষ্ণবধর্মে প্রভাবিত করেছিল।''[১]

পরে একসময় শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের নেতৃত্বে কিছুদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়। তবে চৈতন্যদেব প্রভাবিত প্রেমভাবনার কথা বিভিন্নজনের লেখায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গৌরাঙ্গ সমাজ'। এই 'গৌরাঙ্গ সমাজ' চৈতন্য-প্রেমধর্মকথা এবং নামসংকীর্তন প্রচারে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের উদ্যোগেই এই সময় চৈতন্যচর্চার ক্ষেত্রে যে আবেগ লক্ষ্য করা যায় তা উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকেও প্রভাবিত হয়। গৌরাঙ্গ সমাজের মুখপত্র হিসেবে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' (১৯০১ খ্রি.) প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি দুবছর প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে চৈতন্যদেব প্রভাবিত প্রেমধর্মকথা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্বাস, শ্রীবাস : বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 3-12, ISSN 2249-4332

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে একটি অবৈষ্ণব পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম 'সাহিত্য পত্রিকা'। তাতে দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা 'গোবিন্দদাসের কড়চা' এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা 'চৈতন্যভাগবত' প্রবন্ধ দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্র সেন খুব সহজ সরল ভাষায় গোবিন্দদাসের কড়চা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন যার মধ্যে দিয়ে বিশ শতকের প্রথম দশকেও চৈতন্যজীবনকথা নতুনভাবে আমাদের কাছে উঠে এসেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা থেকে জানা যায় গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দুবছর ভ্রমণ করেছিলেন, এই দুবছরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি যা লিখেছেন সবই তাঁর চাক্ষুষ ঘটনা। তাঁর বর্ণিত কাহিনিতে অলৌকিক অংশ খুবই কম। এসব কারণে আমাদের এই বইটির উপর বিশেষ আস্থা জন্মেছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যেতে পারে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বিশেষের উদ্ধারের কথা আছে, প্রায় তার সব স্থানেই কোনো দৈব ও অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করা হয়েছে। আমাদের মতে, এসব বর্ণনার ফলে আখ্যানগুলির সৌন্দর্য অনেকটা বিলুপ্ত হয়েছে। তবুও গোবিন্দদাসের বর্ণিত দুবছরের বৃত্তান্ত সংবলিত ইতিহাসের মধ্যে অনেক পাপী-তাপীর উদ্ধারের কথা পাই, যার মধ্যে প্রায় কোনো রকমই অলৌকিকতা নেই। অন্যান্য চৈতন্যজীবনী কাব্যের মতো গোবিন্দদাসে সুদর্শন চক্র বা ষড়ভুজ প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়েনি। গোবিন্দ দাসের কড়চায়ও তাঁর মহাভাবের বৃত্তান্ত অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাঁকে স্পর্ধা সহকারে নিজেকে ঈশ্বর বলে পরিচয় দিতে দেখা যায় না। এভাবে প্রাবন্ধিক বিশ শতকের সূচনায় আর একবার গোবিন্দদাসের কড়চার গুরুত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এই কড়চা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন আর একটা সুন্দর কথা বলেছেন—গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বর শূন্যতা কড়চার সর্বত্রই ছিল। সামান্য ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'সাহিত্য পত্রিকা'-য় 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নিবন্ধে লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করেছেন—ক) কড়চার প্রামাণিকতা, ঐশ্বর্য ও প্রেম, খ) মহাভাব : চৈতন্যপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক ভাব, গ) তাঁহার প্রভুভক্তি, ঘ) তাঁহার সত্যপ্রিয়তা, ঙ) পুরীতে প্রত্যাবর্তন। গোবিন্দ দাস যেসব জায়গায় শ্রীচৈতন্যের রূপের বর্ণনা করতে গেছেন সেখানে তাঁর হৃদয়ের গাঢ় ভক্তিপ্রণোদিত কবিত্বের প্রকাশ পেয়েছে—

''যদ্যপি দাঁড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে।
শরীরের প্রভায় আধার নাশ করে।।''[২]

এসব কথার মধ্যে একটুও কল্পনা নেই তা বলা যাবে না। তবে যেটুকু আছে তা স্বাভাবিক। প্রতিদিনকার ঘটনার মধ্যে কোনো অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। আবার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে চৈতন্যদেব যখন পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর—

''ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ।।
সব অঙ্গে ধুলি মাখা মুদিত নয়।''[৩]

দীনেশচন্দ্র সেন 'সাহিত্য পত্রিকা'র মধ্যে স্বল্প পরিসরে যেভাবে সরল ভাষায় গোবিন্দদাসের কড়চার বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে এ ধরনের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ খুব কমই আমাদের চোখে পড়ে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা 'চৈতন্যভাগবত' প্রবন্ধটি। সাধারণ ভাষায় সংক্ষেপে প্রাবন্ধিক অনেক মহাত্মার আবির্ভাবের কথা এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবের কথা বলে চৈতন্যদেবের কথা বলেছেন। বাংলায় একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। এর অবসানে শৈবধর্মের প্রাধান্য পায়। তারপর আসে বৈষ্ণবধর্মের শ্রীবৃদ্ধি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবরা একসময় তাঁকে ঈশ্বররূপে বিশ্বাস করতেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর মাতার কাছে, নিত্যানন্দের কাছে, চৈতন্যদেবের সহচরবৃন্দের কাছ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্কে শুনে তা চৈতন্যভাগবতে স্থান দেন। প্রাবন্ধিক সরল গদ্যে সব বলেছেন। যাঁদের কাছে শুনেছেন তাঁরা সবাই চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করতেন। তবে যে গ্রন্থ যত বেশি চৈতন্যপরবর্তী সে গ্রন্থে তত বেশি অলৌকিকতা স্থান পেয়েছে। চৈতন্যভাগবতের

বর্ণনায় দেখা যায় তাতে গোস্বামীগণের মতের কথা স্থান পেয়েছে। চৈতন্যদেব সেখানে গোপীভাবে উন্মত্ত হননি, আবার রাধাভাবে পাগলের মতো করেননি। কারণ চৈতন্যভাগবতে রাধার নামের উল্লেখ নেই। প্রাবন্ধিক চৈতন্যদেবের উদারতার কথা খুব সহজভাবে তুলে ধরেছেন। ভাষাগত দিক থেকেও যে চৈতন্যভাগবতের আলাদা মূল্য আছে সেকথাও প্রাবন্ধিক স্মরণ করাতে ভুলে যাননি। তৎকালীন নবদ্বীপ তথা বঙ্গভূমিতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল এবং যে সামাজিক অবস্থান ছিল তার সঙ্গে আরও কিছু সুন্দর সুন্দর উপদেশের কথা তুলে ধরে প্রাবন্ধিক বিশ শতকের প্রথম দশকে চৈতন্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

চৈতন্যস্মরণকেন্দ্রিক একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল 'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা' ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ হয়। এটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র। এই পত্রিকার ১ম ভাগের যতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির প্রথম পাতায় শ্রীগৌরাঙ্গের গুণকীর্তন করা হয়েছে—

> ''শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা,
> হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।''[৪]

'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা'র ১ম ভাগের প্রথম সংখ্যায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন, ৪১৬ গৌরাঙ্গ) প্রকাশিত বিষয়গুলি হল— (১) শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা, (২) ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, (৩) শ্রীগৌরাঙ্গচাদের জয়, (৪) শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, (৫) উপদেশামৃত, (৬) মহাজনী পদ, (৭) সংবাদ। নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ, সঙ্গীত, সাধু মহান্তগণের জীবনী, গৌরাঙ্গ সমাজ বা অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত সংবাদও এখানে প্রকাশিত হতে থাকে। গৌরাঙ্গদেবই যে সবার আশ্রয় এবং তাঁর আচরিত ধর্মই যে সবার অবলম্বন তা পত্রিকায় প্রচারিত। সবচেয়ে বড়ো কথা গৌরাঙ্গদেবই এই পত্রিকার জীবন, যে জীবনকে রক্ষা করবেন গৌরভক্তগণ। পত্রিকায় উল্লেখ আছে সব ধর্মের মূল সুর এক এবং এখানে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, এখানে নামযজ্ঞ ও দরিদ্র সেবাই হল সর্বোত্তম।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র, ৪১৬ গৌরাব্দ) প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় সব ধর্মের সারকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে ভালোবাসাই ধর্ম, ভালোবাসা ছাড়া উপায় নেই এবং সব ধর্মের সার হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করলেই সব আশা পূর্ণ হয়। কেননা তিনি গৃহী-বৈরাগী, পাপী-তাপী সবাইকে হরিনাম দ্বারা উদ্ধার করেছেন। এই সংখ্যায় শিশিরকুমার ঘোষের লেখা একটি নগরকীর্তনের উল্লেখ আছে—

> ''(আর) ভয় নাই ভয় নাই, আন্ধার গেল।
> নবদ্বীপে চাঁদের উদয় হ'ল। ...
> শ্রীগৌরাঙ্গের জয় জয় বল।।
> জয় জয় জয় বলরে।''[৫]

নামকীর্তনে গৌরাঙ্গের জয়গানের মধ্যে মধ্যে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণের কথা আছে। সবেরই মূলতত্ত্ব গৌরাঙ্গদেব। তাঁর মধ্যে আছে সমস্ত স্বরূপ। পাশাপাশি আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, আধুনিক যুগে যে যুক্তিবাদের কথা বলা যায় তার নমুনা এখানে আমরা লক্ষ্য করি। ভাষার মূল যেমন কয়েকটি বর্ণ, যার দ্বারা ভাষার লালিত্য, মধুরতা প্রকাশ করা যায়, ঠিক তেমনি গৌরাঙ্গদেব হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল। তাঁকে ছাড়া গতি নেই। তাঁর দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সব তত্ত্ব, অবতার সৌন্দর্য ইত্যাদির বিকাশ ঘটেছে। বৃন্দাবনের পরম মাধুরী মাধুর্যরস, রাধাতত্ত্ব ইত্যাদি গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে দিয়েই জানা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের নামকীর্তন করলে নির্মল হৃদয়ে সব ভাবের বিকাশ ঘটে। ছাত্ররা যখন বলেন তারা কৃষ্ণনাম জানেন না তখন প্রভু তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

> ''হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
> যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
> গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন।''[৬]

উল্লেখ করা প্রয়োজন 'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা'র ১ম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছু গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। যেমন—শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত, কালাচাঁদ গীতা (সচিত্র কাব্য), শ্রীনরোত্তম চরিত, শ্রীপ্রবোধনন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, হিন্দি ভাষায়—শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাইচরিত। সবেরই মূলে প্রায় চৈতন্যজীবন বা তাঁর প্রভাবিত প্রেমভাবনার কথা আছে। চৈতন্যচর্চাকেন্দ্রিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত গ্রন্থগুলির ভূমিকা আছে। বিশেষ করে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের লেখা 'শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যে লেখা বৃহত্তর চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বাংলা ছাড়া হিন্দি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্যজীবনকথা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অন্য ভাষার মধ্যে দিয়েও প্রসারিত হয়েছে। সেই হিসেবে বলা যায় বিশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকাটির গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম ভাগের তৃতীয় সংখ্যায়, ১৯০১ খ্রি. (বৈশাখ ৪১৬ গৌরাব্দ) উঠে এসেছে মহাপ্রভুর গুণকীর্তনের কথা। তিনি পাপী-দুঃখী-কাঙালের ঠাকুর। জীবকে উদ্ধারের জন্যই তিনি নাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। একসময় বৈষ্ণবধর্ম দুর্বল হয়ে পড়লে অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা তথা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের নেতা শিশিরকুমার ঘোষ তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় তিনি কয়েকটি গ্রন্থ (যেমন—শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাইচরিত, The Lord Gouranga ইত্যাদি) রচনা করে শ্রীগৌরাঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা প্রকাশের আগে একসময় বৈষ্ণবধর্মের নামে অনেকে ঠাট্টা-তামাসা-বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু এমনই ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের আশীর্বাদে এই পত্রিকার মাধ্যমে মহাপ্রভু প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আবার সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। সংকীর্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমের জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। বিশ শতকের সূচনায় তা আবার কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। এখানে সংকীর্তন তালিকায় ২০৪টি নাম উল্লেখ আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম ভাগের চতুর্থ সংখ্যার, ১৯০১ খ্রী. (জ্যৈষ্ঠ ৪১৬ গৌরাব্দ) সম্পাদক ছিলেন শ্রীনারায়ণ চন্দ্র এবং শ্রীদুর্গাদাস চন্দ্র। পত্রিকার সূচিপত্রে উল্লেখ ছিল চারটি বিষয়—ক) শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, খ) সুখী পরিবার, গ) বিবিধ, ঘ) সংবাদ। গৌরাঙ্গলীলাকে সব ধর্মের সার বলে উল্লেখ করা হয়েছে 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা' অংশে। প্রেম ও ভক্তিই সেখানে প্রধান এবং এর প্রধান অঙ্গ হল জ্ঞান ও কর্ম। গৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের কথা নতুন করে এই পত্রিকার এই সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে—''যাঁর তদগতচিত্ত অবস্থা তারই 'তৃণাদপি সুনিচেন ধর্ম্ম''। গৌরাঙ্গদেব তাঁর মনুষ্যরূপী সহজ সরল লীলার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের কথা বলেছেন তা ভক্তমাত্রই স্বীকার করেন। তাঁর প্রভাবেই বৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় সম্পদ উদ্ধার হয়। তিনি যার হৃদয়ে অবস্থান করেন তার দ্বারাই প্রেমধর্ম প্রকাশিত হতে পারে। মহাপ্রভুকে বুঝতে হলে একমাত্র ভরসা নামকীর্তন বা শ্রবণ এবং বৈরাগ্য, যে বৈরাগ্যে থাকবে ঈশ্বরপ্রেম, যার যাতে সুবিধা তার তাতে ব্যবস্থা। মনে ভক্তি থাকলে যার যা আবশ্যক তা সে পায়। কারণ মহাজনেরা বলেন—

''মুচী হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হয়ে মুচী হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।।''[৭]

গৌরাঙ্গদেব এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বরপুরীর (যিনি জাতিতে শূদ্র) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁর ধর্মই হল 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'।

'সুখী পরিবার' অংশে বলা হয়েছে সর্ব অবতারের সার হলেন শ্রীশচীনন্দ। কারণ গৌরাঙ্গ হলেন কাঙ্গালের নিত্যধন এবং তিনি অমানীরে মান দিয়ে বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার করেছেন। 'বিবিধ' অংশ গৌরাঙ্গের গুণকীর্তন করা হয়েছে একটি গানের মধ্যে দিয়ে—

''পাঠক! জান কি ভাই, তিনি কোন্ জন?
কোথা তার ভবন
যিনি নদীয়া নগরে, একদিন প্রতি ঘরে,

বিলিয়েছেন প্রেমনিধি শ্রীহরি নাম।
নামে মাতালেন যিনি এই ভবধাম।
'নিমাই' তাহার নাম।'[৮]

শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায়, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে (আষাঢ় ও শ্রাবণ ৪১৬ গৌরাব্দ) প্রকাশিত কিছু কবিতার মধ্যে দিয়ে গৌরাঙ্গদেবের কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। 'গৌরাঙ্গ সমাজোৎপত্তি' অংশে শিশিরকুমার ঘোষের বর্ণনা অসাধারণ। শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ ভারতী মহাশয় বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় (কলকাতা, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, রাঁচি, কটক, বালেশ্বর, পাঞ্জাব, রাউলপিণ্ডি) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম-বিষয়ক নানা কথা বক্তৃতার দ্বারা প্রচার করেন সেকথা এই পত্রিকা থেকেই জানা যায়। এই প্রচারের ফলে গৌরাঙ্গ-প্রেমধর্ম নতুন করে মানুষের মনকে উজ্জীবিত করেছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম ভাগের সপ্তম সংখ্যায়, ১৯০১ খ্রী. (ভাদ্র ৪১৬ গৌরাব্দ) শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের প্রচার, শ্রীসংকীর্তন তালিকা অংশে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের নানা দিক এবং তাঁর গুরুত্ব মানুষের কাছে নতুন করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও গৌরাঙ্গ -প্রেম-ভাবনার কথা নতুন করে মানুষের মধ্যে চর্চিত হতে থাকে।

এরপর ১৯০৮-০৯ খ্রি. (আষাঢ়, ৪২৩ গৌরাব্দ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ৪২৪ গৌরাঙ্গ পর্যন্ত) শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ এর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা'টি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার তৃতীয় অধ্যায় থেকে সীতাকুণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রম থেকে শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় সেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এখানে কবিতার মাধ্যমেই গৌরাঙ্গের আনন্দ গান করা হয়েছে। চতুর্থ সংখ্যায় আছে শ্রীগৌরাঙ্গের সাধন ভজনের কথা। তাঁর কৃপা ছাড়া জীবের মুক্তির অন্য কোনো উপায় নেই। তাঁর প্রচারিত ধর্মই বৈষ্ণবধর্ম। যারা এই বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তারাই শ্রীগৌরাঙ্গের সুশীতল মাধুর্য অনুভব করেছেন, বাকিরা অনেক দূরে। পত্রিকা থেকে জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র বিশেষভাবে অনুশীলন করলেই শিক্ষামৃতের (শিক্ষাষ্টক) উপদেশ বোঝা যায়। পত্রিকায় উল্লেখিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মহাজনী পদ চৈতন্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্য মাত্রা পেয়েছে। এর মধ্যে দু-একটি পদ উল্লেখনীয়—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ।
গৌরাঙ্গ ভজিলে জীবের হবে পরিত্রাণ।।"[৯]

অন্য একটি পদে— "ভজ গোরাচাঁদের চরণ;
এ তিন ভুবনে ভাই, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিত পাবন।"[১০]

এই পত্রিকার সংবাদ অংশ থেকে জানা যায় শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের কৃচ্ছ্রসাধনায় অনেক ভক্ত বৈষ্ণবধর্মের দিকে ঝোঁকেন এবং তাঁর প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মধ্যে দিয়ে 'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা' উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা' ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ) থেকে প্রকাশিত হয়। পরে সম্পাদক হন যথাক্রমে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য তৎকালে যা খরচ হত তার ব্যয় বহন করতেন স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর মহাশয়। পত্রিকায় অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি—একটা সময়ে নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা ছিল বাংলাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যার জন্য নবদ্বীপকে বলা হত বাংলাদেশের অক্সফোর্ড। সেসময় কোনো দেশে কেউ পণ্ডিত বিবেচিত হওয়ার আগে তার পাণ্ডিত্য যাচাইয়ের জন্য সবশেষে নবদ্বীপে আসতে হত। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ

শাস্ত্রযুদ্ধে অন্যান্য জায়গায় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে যতক্ষণ না পর্যন্ত পরাজিত করতে পারতেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ গৌরব অনুভব করতেন না। এরকম বিদ্যাচর্চার কথা আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করেছি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এভাবে 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা'য় চৈতন্যপ্রেমের ধারা অব্যাহত থেকেছে।

'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অগ্রহায়ণ (১৩২০ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় বিপিনবিহারী দাস সরকার ভক্তিরত্নের লেখা 'দিগ্বিজয়ী পরাজয়' নামাঙ্কিত রচনায় তারই একটা সুন্দর বিশ্লেষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে দেখা যায় চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দিগ্বিজয়ী কেশব নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিনয়ের খনি নিমাইচাঁদ অমনি বলেন পণ্ডিত জি! আপনি বহু দেশ জয় করে এসেছেন, সুতরাং আমি আর আপনার সঙ্গে কি শাস্ত্রালোচনা করব? তবে যদি অনুগ্রহ করে এই হরিভক্তি প্রদায়িনী গঙ্গার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করেন, আমরা কৃতার্থ হব। তৎক্ষণাৎ কাশ্মীরী পণ্ডিত ঝড়ের বেগে একশত স্বরচিত শ্লোক বর্ণনা করলেন। শুনে নিমাই পণ্ডিত বললেন—এবারে শ্লোকের দোষগুণ বিচার করা যাক। কেননা বিচার না করলে তো প্রকৃত রসস্বাদন করা যায় না। একথা শুনে বিস্মিত কেশব বালক নিমাই পণ্ডিতকে জানালেন—

"বৈয়াকরণী তুমি নাহি জান অলঙ্কার।
তুমি কি বুঝিবে এই কবিত্বের সার।।"[১১] (চৈ. ভা)

সঙ্গে সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত একশত শ্লোকের এক-একটি করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। প্রথমেই নিম্নোক্ত শ্লোক উত্থাপন করেন—

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদামাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরণরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।"[১২]

এবং পাঁচটি দোষের কথা বলেন। সেগুলি হল—দুটি অবিমিষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, বিরুদ্ধমতিকারিতা, পুনরুক্তি, ভগ্নক্রমতা। এর ফলে কাব্যের মাধুর্য ও কবিত্ব নষ্ট হয়েছে। ঠিক যেমন অনেক দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়লে সব দুধ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি নানা রসমিশ্রিত কাব্যেও একমাত্র অলঙ্কারের দোষ ঘটলে তা কবিত্বহীন হয়ে পড়ে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যিনি নিজেকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে ভাবতেন তিনি নিমাই-এর প্রতিভা দেখে অবাক তো হলেনই, সঙ্গে পরাজয়জনিত অপমানে তাঁর গাল-মুখ লাল হয়ে চোখ ছলছল করতে লাগলো। কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতেই নিমাই পণ্ডিত কেশবের মুখ দেখে অন্তরে দুঃখ অনুভব করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিনীতভাবে বললেন—

> "আপনার শ্লোকে দুই স্থানে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, পুনরুক্তবদাভাস) ও তিন স্থানে অর্থালঙ্কার (উপমালঙ্কার, বিরোধাভাসালঙ্কার, অনুমানালঙ্কার) থাকিয়া শ্লোকের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে।"[১৩]

আরও বললেন—

> "পণ্ডিত ঠাকুর আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার মত পণ্ডিত আর এখন ভারতবর্ষে নাই। আপনার কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কবিতা কি প্রতিভাময়ী। দোষ না আছে কোন কাব্যে? ভবভূতি, কালিদাসের মহাকাব্যেও অনেক দোষ রয়েছে আপনি দুঃখিত হবেন না, আমার এই বালকসুলভ চপলতা ক্ষমা করবেন।"[১৪]

নিমাই পণ্ডিতের বিনয়ী ব্যবহারে দিগ্বিজয়ী কেশবের অভিমান দূর হলেও মনের থেকে পুরোটা মেনে নিতে পারেননি।

সেদিন বিদায়কালে নিমাই পণ্ডিত পরদিন সাক্ষাতের অনুরোধ জানালেন। সেদিন ফিরে দিগ্বিজয়ী কেশব সারারাত দেবী সরস্বতীর ধ্যান করে এই কামনা করতে থাকেন যে পরদিন সকালে যেন নিমাই পণ্ডিতকে হার মানাতে পারেন। কিন্তু শেষরাতে তন্দ্রাঘোরে দেবী সরস্বতীর কাছে শুনলেন—

> ''বৎস! তুমি কাহার সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিতেছ? নিমাই পণ্ডিত কি মানুষ? তিনি ইচ্ছা করিয়া না হারিলে কি মানুষ তাঁহাকে হারাইতে পারে? আমার ধ্যান করিলে কি হইবে? শত শত যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত আমি তাহার ধ্যান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব তুমি কল্য প্রাতঃকালে যাইয়া তাঁহার চরণ কমলে শরণ নেও।''[১৫]

এই আদেশে পরদিন সকালে দিগ্বিজয়ী কেশব নিমাই পণ্ডিতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। নিমাই পণ্ডিত তাকে আলিঙ্গন করে বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করার কথা বলেন এবং সময় হলে পুনরায় দর্শনও পেতে পার বলে আশ্বাস দেন। এরপর কেশবজী উদাসীন বেশে বৃন্দাবনের পথে চলে যান।

এখানে নতুন কথা বিশেষ নেই কিন্তু বিশ শতকের শুরুর দিকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা' কেশব-নিমাইয়ের কথোপকথন যেন আবার নতুন করে উদ্ভাসিত হল। দেখা গেল পণ্ডিতের অহংবোধ চূর্ণ হওয়ার চিত্র। পাশাপাশি নিমাই এর পাণ্ডিত্য, বিনীত ব্যবহার, ধীর-স্থির ভাব, মানুষের প্রতি ভালোবাসা যেন চিরন্তন রূপ পেয়েছে। পাঁচশো বছরেরও আগে যে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের কাছে কেশব কাশ্মীরীর পাণ্ডিত্যের অহংবোধ চূর্ণ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত নিমাই পণ্ডিত তাকে আলিঙ্গন দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা'র মধ্যে দিয়ে এসব ঘটনার উত্থাপন হওয়াতে চৈতন্যদেবের প্রেম-ভাবনা নতুন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় 'বিজয়া' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরের বছর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকায় যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের লেখা—''শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম'' নামক প্রবন্ধটি বের হয় যা চৈতন্যচর্চারই নামান্তর। প্রাবন্ধিক খুব অল্প কথায় চৈতন্য-প্রেমকথাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা তার কয়েকটি লাইন নিজের ভাষায় তুলে ধরে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম পতিত পাবন, তাঁর একটি নাম পাষণ্ড-উদ্ধারণ, একটি নাম কাঙ্গালের ঠাকুর, একটি নাম প্রতাপরুদ্র সন্ত্রাতা, একটি নাম সার্বভৌমের উদ্ধারকর্তা, একটি নাম সংকীর্তন পিতা, একটি নাম বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নামে প্রেমে বিশ্বপূর্ণকারী। মহাপ্রভুর এইসব নাম থেকেই বোঝা যায় তাঁর ধর্মমত কত উদার। যিনি যে ধর্মের প্রবর্তক, তিনি যদি সেই ধর্মের পূর্ণ আদর্শ না হন, তবে তাঁর ধর্মমত সংস্থাপন হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছিলেন তাঁর ধর্মের পূর্ণ স্বরূপ। প্রাবন্ধিক এসব কথা যুক্তিসহ খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গৌরাঙ্গের প্রেম, তাঁর উদারতা, পাপী-তাপী-দীনহীনের প্রতি তাঁর ব্যবহার দ্বিতীয় কোথাও দেখা যায় না। পাপীর প্রতি চিরকাল কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ছিল কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। নিমাই সেখানে হরিনামকে হাতিয়ার করে মানুষকে মুক্তি দিলেন, মুক্তির পথ দেখালেন। যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও এভাবে চৈতন্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ পত্রিকা'। এটি অবৈষ্ণব পত্রিকা হলেও এর মধ্যে চৈতন্যচর্চামূলক কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বিপিনচন্দ্র পালের লেখা একটি প্রবন্ধ বের হয়। প্রবন্ধটির নাম 'তদুচিত গৌরচন্দ্র'। যার মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের লীলাকথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে নানারকম যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান থাকলেও ক্রমে তা লোপ পায়। এর বদলে মহাপ্রভু নামযজ্ঞের কথা প্রতিষ্ঠা করলেন—'কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর।' একমাত্র যজ্ঞের নাম 'নামযজ্ঞ'। বৃন্দাবনদাসের কথায়—'শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান / করিবেন আস্বাদন / পূরিবে সবার অভিলাষ।' মহাপ্রভু একাই আস্বাদন করতেন। প্রাবন্ধিক ভগবতগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বের কথা তুলে ধরে ভগবানের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। পাশাপাশি কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের আশ্রয়ে চৈতন্যদেবের অবতার-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

সেকথাও জানিয়েছেন।

বিশ্লেষণে দেখা যায় গৌরাঙ্গলীলা অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণলীলা বোঝা অনেক সহজ। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমযুগলের কথার মধ্যে দিয়ে যে পরিপূর্ণতা আছে, প্রেমের বিশুদ্ধতা আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমলীলা বুঝতে হলে আমাদের নবদ্বীপে অবস্থান করতে হবে যেখানে লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তবে মহাপ্রভু নিজের মধ্যে পূর্বরাগ, বিরহ-মিলন ইত্যাদি আস্বাদন করেছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমলীলাতে প্রত্যক্ষ কোনো যুগলের কথা নেই। তিনি নিজেই একই দেহের মধ্যে যুগ্মসত্তাকে অনুভব করতেন যার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারি না। আমাদের একত্বের মধ্যেই যে দ্বৈত আছে তা আমরা বুঝতে পারি না। এর জন্য দরকার একজন সদগুরুর। এরূপ সদগুরু লাভ করা সহজ নয়। যে গুরু আপনার মধ্যে, আপনার অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ অনুভূতিতে পুরুষ প্রকৃতির নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করে মহাপ্রভুর মতোই দিনরাত সেই লীলারসে মগ্ন থাকেন কেবল তিনিই গৌরাঙ্গলীলার ও রাধাকৃষ্ণ-লীলার সত্য অনুভব করতে পারেন। এমন গুরু লাখে একজন মেলে না। যতদিন না এমন সদগুরু লাভ হয় ততদিন 'তদুচিত গৌরচন্দ্রের' মর্মগ্রহণ সম্ভব নয়।

নারায়ণ পত্রিকায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সেকালের নবদ্বীপ' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে উঠে এসেছে সমকালের নবদ্বীপের চিত্র। পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপ বড় সমৃদ্ধ ছিল। শহর, রাস্তাঘাট পরিপাটি ছিল। গৌরাঙ্গের নগর পরিভ্রমণের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে জানা যায় তৎকালীন নবদ্বীপ সমাজের কথা। জানা যায় বিভিন্ন পল্লীতে নানা জাতির লোকের বসবাসের কথা। সমাজে পণ্ডিতদের কদর ছিল। এক সময় নবদ্বীপ হয়ে ওঠে পণ্ডিতদের জন্য প্রসিদ্ধ।

প্রাবন্ধিক গৌরাঙ্গদেবকে সবার শিরোমণি করে তোলার জন্য দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রথমত, রঘুনাথ একদিন গাছতলায় বসে এক জটিল প্রশ্নের সমাধানে মগ্ন ছিলেন। সে সময় পিঠে কাকে মলত্যাগ করেছে খেয়াল নেই, এমন সময় নিমাই পণ্ডিত স্নান করে ফিরছেন, বালক নিমাই-এর স্নানের ঘাটে উৎপাতের কথা বাল্যলীলা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেছেন। তারই উপসংহারে গল্প-রচয়িতা বলেছেন—রহস্যপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত ভিজে কাপড় নিঙড়িয়ে রঘুনাথের পিঠে জল দেওয়ায় তিনি চমকে উঠে বলেন—'নিমাই, ব্যাপার কি?' নিমাই বলেন—'পিঠে কাকে যে বাহ্য করেছে?' রঘুনাথ বলেন—'পড়াশুনা করতে হলে মনঃসংযোগ চাই, তোমার মতো ভেসে ভেসে বেড়ালে চলে না।' চিন্তার বিষয়টা কি জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ যে সমস্যার আলোচনা করছিলেন তাতে ছয় প্রকার পূর্বপক্ষ এবং সেই সমস্তের যথাযথ মীমাংসা শুনিয়ে অবশেষে যে আপত্তি উঠতে পারে তা জ্ঞাপন করলে গৌরচন্দ্র অনুমাত্র চিন্তা না করেই তার সদুত্তর দিলেন।

দ্বিতীয় আর একটি গল্পে দেখা যায় একসময় রঘুনাথ ও নিমাই এক নৌকা করে যাবার সময় নিমাইয়ের বগলে একটি পুথি দেখে জানতে চাইলে নিমাই বলেন 'ওটি ন্যায়ের পুথি।' একথা শুনে রঘুনাথ বিষণ্ণ বদনে বলেন—এই ন্যায়ের টীকা প্রচারিত হলে তাঁর টীকার আর কদর থাকবে না। রঘুনাথের দুঃখ দেখে নিমাই তাঁর পুথিটি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনার কথা ঈশানদাসের অদ্বৈতপ্রকাশ থেকে জানা যায়। শ্রীচৈতন্যের স্বার্থত্যাগ, শিক্ষা-দীক্ষা, সেকালের শিক্ষা প্রণালীর পাশাপাশি মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ পণ্ডিত, বাসুদেব সার্বভৌম, তাঁর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ প্রমুখের অবদানে বিদ্যানগর নবদ্বীপ হয়ে উঠেছিল আলোকোজ্জ্বল।

'মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম সংবাদ' শিরোনামে অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থের লেখাটি নারায়ণ পত্রিকায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে শুরু করে সার্ব্বভৌমের ভাষ্য মহাপ্রভু কর্তৃক খণ্ডন-তত্ত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের মধ্যেও চৈতন্য প্রেমধারা অব্যাহত থেকেছে।

এসব পত্র-পত্রিকাগুলি ছাড়াও আরও কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—বিশ্বজনীন, উপাসনা, সাহিত্য

সংহিতা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, আলোচনা, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি। যার মধ্যেও বিভিন্ন জনের লেখায় উঠে এসেছে চৈতন্য-প্রেমভাবনার কথা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজনীন পত্রিকায় প্রকাশিত রামেশ্বর দাসের প্রবন্ধ 'চৈতন্যাব্দ', ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে উপাসনা পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শিবচন্দ্র শীলের লেখা 'শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান নিরূপণ', ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আলোচনা পত্রিকায় আনন্দগোপাল সেনের লেখা প্রবন্ধ 'শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব', ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় পুলিনবিহারী দত্তের লেখা প্রবন্ধ 'বারাণসী ধামে চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণ' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে চৈতন্যজীবনের নানান দিক উঠে এসেছে।

আলোচ্য পত্রিকাগুলি ছাড়াও আরও কিছু পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে নানা অনুষঙ্গে উঠে এসেছে চৈতন্যদেবের কথা। তার কয়েকটি হল—

প্রকাশকাল	পত্রিকার নাম	ধরণ	স্থান	সম্পাদক
১৯০১ খ্রি.	ভক্তি	মাসিক পত্রিকা (বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক)	কলকাতা	শ্রীভাগবত ধর্মমণ্ডল
১৯০৩ খ্রি.	হরিভক্তি তত্ত্ব	মাসিক পত্রিকা	সয়দাবাদ, বহরমপুর	হরিচরণ বন্ধু
১৯০৩-০৪ খ্রি.	শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী	—	এলাটি/হুগলী	মধুসূদন দাস অধিকারী
১৯০৭ খ্রি.	বেদান্তদর্শন	মাসিক পত্রিকা	কলিকাতা	সারদানাথ দত্ত
১৯১৩ খ্রি.	শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সেবক	মাসিক পত্রিকা	কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ	পূর্ণচন্দ্র রায়
১৯১৪ খ্রি.	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বপ্রচারক	মাসিক পত্রিকা (বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার বিষয়ক)	—	প্রিয়নাথ নন্দী।[১৭]

চৈতন্যচর্চাকেন্দ্রিক আলোচনার উপান্তে এসে একথাই বলবো যে আমরা কয়েকটি মাত্র পত্র-পত্রিকার কথা আলোচনা করেছি এবং কিছু পত্র-পত্রিকার কথা সূত্রাকারে বা নামমাত্র তুলে ধরেছি। এসব কাজের অনেকটাই ক্লারিক্যাল, তবুও বলবো এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। কেননা চৈতন্যচর্চার ধারা ষোড়শ-সপ্তদশ পেরিয়ে উনিশ শতক হয়ে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা পত্র-পত্রিকায়ও পড়েছিল।পত্র-পত্রিকাগুলি গৌরাঙ্গদেবের গুণকীর্তন, নগরকীর্তন, গৌরলীলা, প্রেমধর্মের কথা, মানবতার কথা, বৈষ্ণবধর্মের কথা ইত্যাদি প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্যদেবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সমকালে যেভাবে মহামানব শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সহজ-সরল ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে হরিনাম সংকীর্তনকে হাতিয়ার করে সমস্ত বাঙালিকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন সেই ধারা বিশ শতকের প্রথম দুই শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকায়ও পড়েছে এবং এখনও তা প্রবহমান।

তথ্যসূত্র :

১. অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঊনবিংশ শতকের ভক্তিযোগ ও নবগৌরাঙ্গ আন্দোলন, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৬১।
২. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রকাশিত, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংখ্যা, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের নিবন্ধ 'গোবিন্দদাসের কড়চা'।
৩. তদেব, ঐ।

৪. শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র ভবকিঙ্কর কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, সিমুলিয়া ১ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কৃপানন্দ যন্ত্রে শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত, শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, ফাল্গুন, প্রথম সংখ্যা-৪১৬ গৌরাব্দ।

৫. তদেব, প্রথম ভাগ চৈত্র, ৪১৬ গৌরাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৬. তদেব, প্রথম ভাগ চৈত্র, ৪১৬ গৌরাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৭. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র এবং শ্রীদুর্গাদাস চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সিমুলিয়া ১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কৃপানন্দ যন্ত্রে শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত, 'শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা' ১ম ভাগ জ্যৈষ্ঠ ৪১৬ গৌরাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা।

৮. তদেব, ঐ।

৯. শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত 'গৌরাঙ্গ পত্রিকা' ৪র্থ সংখ্যা, সীতা কুণ্ডু শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রম থেকে শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় সেন কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম ভাগ চৈত্র ৪১৭, গৌরাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা, মহাজনী পদের উল্লেখ অংশ।

১০. তদেব, ঐ।

১১. ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর মহাশয়ের আর্থিক আনুকূল্যে কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ) থেকে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২০, পৃ. ৫৪৮-৫৫৭।

১২. তদেব, ঐ।

১৩. তদেব, ঐ।

১৪. তদেব, ঐ।

১৫. তদেব, ঐ।

১৬. রমেনকুমার সর, চৈতন্য জীবন-প্রসঙ্গ সেকাল ও একাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৯।

১৭. অশোককুমার রায় সম্পাদিত, বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ক্রমবিকাশপঞ্জি, অতএব প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬ থেকে সংগৃহীত।

শ্রীবাস বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পোলবা মহাবিদ্যালয়, পোলবা, হুগলি

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' ঃ শ্রেণিচেতনার অন্তরালে নিম্নবর্গের মানুষ

অর্ঘ্য হালদার

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে হতমান প্রান্তিক অন্ত্যজ জনজাতি বা voiceless section of Indian society মানুষের ভিড়। সমাজের বৃহৎ অংশ জুড়ে তাদের অবস্থান হলেও বৈষম্যমূলক সমাজে যুগ যুগ ধরে যারা অবহেলিত শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। প্রাচীন ভারতে আর্যায়ণের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যেও বৈষম্যমূলক বর্ণবিভাজন ছিল। তাদের বর্ণানুযায়ী কর্মভেদ ছিল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (দশম মণ্ডলের নব্বইতম সূক্ত) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> ''ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।।
> ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত।।''[১]

সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়েছে, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি, বৈশ্যের উদ্ভব ঊরুদেশ থেকে এবং শূদ্রের জন্ম হয়েছে পদযুগল থেকে। বৈদিক সাহিত্যে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তির মধ্যেই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বৈদিক যুগে যে বর্ণব্যবস্থা ছিল তা প্রমাণিতও হয়। তৎকালীন যুগে শূদ্রের স্থান ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পায়ের তলায়। আর্য সভ্যতার প্রসারে শূদ্ররাই ছিল সমাজে অবহেলিত। তারাই কেবলমাত্র পরিশ্রমসাধ্য কর্ম করতে বাধ্য থাকত। তৎকালীন সমাজে পেশাগত দিক দিয়ে তারাই ছিল নিম্নবর্গের মানুষ। সাম্প্রতিক কালে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি সাহিত্যালোচনায় বহুল চর্চিত একটি বিষয়। বিশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে 'Subaltern' চর্চা শুরু হলে রণজিৎ গুহ 'Subaltern' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইতালিয় কমিউনিষ্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭)-র ব্যবহৃত 'Subaltern' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আন্তেনিও গ্রামশি তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোট বইতে' (A Prisoner's Note Book) (১৯২৯-১৯৩৫) সেন্সরের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে রূপকের সাহায্য নিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি Dominant-র শ্রেণির বিপরীতে 'Subaltern' শব্দটি ব্যবহার করেন।

> ''গ্রামশি 'সাবলটার্ন' শব্দটি কখনো প্রলেটারিয়্যাট এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো বা শিল্পশ্রমিক নয়, সামাজিক বিবর্তনের যে কোনো স্তরেই প্রভুত্ব বা অধীনতার সম্পর্ক বিন্যাসে কর্তৃত্বকারী শক্তির বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।''[২]

মার্কসীয় সমাজতত্ত্বানুযায়ী, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শ্রমবৈষম্য মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল।

> ''Marxist Sociology start from the premise that the primary function of social organization is the satisfaction of basic human needs–food, clothing and shelter.''[৩]

মার্কস-চর্চার সূত্র ধরেই সমাজতত্ত্বের আলোচনায় নিম্নবর্গের ধারণাটি এসেছে। ইংরেজি ভাষায় শব্দটিকে সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের অধস্তন বা নিম্নপদস্থ সেনাপতিদেরকে বোঝানো হত।

> ''Subaltern : adj successively : holding or held of a vassal : (of officers) under the rank of captain : Particular(log) : being at once genus and species of a higher genus(log) n.a subordinate : a Subaltern officer : a proposition different

হালদার, অর্ঘ্য : মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' ঃ শ্রেণিচেতনার অন্তরালে নিম্নবর্গের মানুষ
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 13-20, ISSN 2249-4332

> from another in quantity alone (both being a affirmation or both negative, but one universal the other particular; log)''[৪]

নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক দিক দিয়ে নানান বিতর্ক থাকলেও—

> ''পেশাগত দিক থেকে হীনকর্মে ব্রতী, জাতিগত দিক থেকে অচ্ছুৎ, অর্থনৈতিক অসাম্যের বলি হয়ে দরিদ্র, শিক্ষাগত দিক থেকে নিরক্ষর, সংস্কৃতি চিন্তায় অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী। বিবিধ ধরণের প্রভুভক্তি এদের শাসন করেছে, শোষণ করেছে, প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে। তাদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বঞ্চনা, অবহেলাকে সঙ্গী করেছে এরা আর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে প্রভু শক্তি। এই অধস্তনদের কোনও দিন প্রভুশক্তির অভাব ঘটে না, অভাব ঘটে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের। সেই পিছিয়ে পড়া, অচ্ছুৎ, মানুষগুলিকে নিম্নবর্গ আখ্যা দেওয়া যায়।''[৫]

ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পূর্বে পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রত্ন-অস্ট্রালয়েজ জাতির যে শাখা ভারতে এসেছিল তারাই এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি করে।[৬] অস্ট্রিক ভাষাবংশ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষাবংশ গুলির অন্যতম। অস্ট্রিক ভাষাবংশ দুটি ভাগে বিভক্ত—অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশীয়। এদের মধ্যে অস্ট্রো-এশিয়াটিক থেকে অনার্য সাঁওতাল, মুণ্ডারী, খাসী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব। 'বিছন' গল্পে বর্ণিত অনার্য গঞ্জ, দুসাদ, মাহাতো, কৈরি অন্ত্যজ জনজাতিরা উক্ত অস্ট্রিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর জীবনের দীর্ঘসময় ভারতবর্ষের অন্ত্যজ জনজাতি মানুষদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহিত্যে ভারতবর্ষের আদিবাসী নানান জনজাতির উপস্থিতি। এই সমস্ত অন্ত্যজ উপজাতিদেরকে মানবদরদী রূপে তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাই শঙ্খ ঘোষ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—

> ''মহাশ্বেতাদির মতো সত্যভাবে কেউই আমরা বলতে পারি না যে, সমস্ত কিছু পিছুটান ভাসিয়ে দিয়ে সেই নিচুতলারই সহপথিক আমার জীবন। সাহিত্য জগতে সে কথা বলতে পারেন ওই একজন, ভব্য সমাজের রীতি-না-মানা ওই একজন, বলতে পারেন যে তিনি বর্ণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের নিপীড়িত দুঃখী সংগ্রামী মানুষের আপনজন।''[৭]

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের নানান জনহিতকর কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে তাদের দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তিদানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ধরে অবহেলিত প্রান্তিক (marginal) মানুষদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের ওপর উচ্চবর্গের অর্থপিশাচ মানুষের শোষণ, বঞ্চনার এক ভয়ঙ্কর রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের দুঃখময় জীবনকে সভ্যসমাজে জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাদের হয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন। পাশাপাশি সহজ সরল পীড়িত, উপেক্ষিত, অশিক্ষিত, অসহায় মানুষগুলিকে শোষণ বঞ্চনাময় দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তি দিতে সামাজিক আন্দোলনে সামনে থেকে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জটিল সমস্যাগুলি প্রতিনিয়ত পিছলেবর্গ শ্রেণির মানুষদেরও নানান আঘাত করে চলেছিল। প্রান্তিক মানুষগুলির ওপর উচ্চবর্গ কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে চলছিল। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> ''সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই, মূল্যায়ণ করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।''[৮]

মহাশ্বেতা দেবী স্বাধীনোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের তোহারি, তামাড়ি সন্নিকটস্থ, বুরুডিয়া, দুসাপট্টি প্রভৃতি অঞ্চলে উচ্চবর্গের প্রশাসনের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী থেকে শুরু করে লছমন সিং, দৈতারি সিংয়ের মতো রাজপুত মহাজন

ব্যবসায়ীদের শোষণে শোষিত গঞ্জু, দুসাদ, কৈরি, ধোবির মতো হতমান নিম্নবর্গের অসহায় মানুষদের শোষণের ভয়ঙ্কর রূপ অঙ্কন করেছেন 'বিছন' গল্পে। গঞ্জু, দুসাদ, ধোবির মতো অন্ত্যজ প্রান্তিক অবহেলিত ব্রাত্যজীবন এক রৈখিক সরলরেখাই চলতে থাকে। তাদের জীবনে কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভরসা থাকে না। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্গের মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও তাদের জীবন থেকে যায় সেই তিমিরেই। সেই সমস্ত প্রান্তিক মানুষদেরকে আত্মসচেতন করাই ছিল গল্পকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই তিনি তাদের আত্মসচেতন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। আলোচ্য গল্পে সহায়-সম্বলহীন অসহায় নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধিরূপে 'মৃত পশুর চামড়া ছোলা' পেশার দুলন গঞ্জুকে এঁকেছেন। স্ত্রী, দুই পুত্র, তাদের বউ, নাতি, নাতনি নিয়ে তার ভরাট সংসার। তার সহায় সম্বল বলতে দু'টো ঘর। যে 'দু'টো ঘর দুই ছেলের দখলে। গঞ্জু দম্পতির স্থান হয়, দাওয়ার কোণে নিম্নে রাখা রামছাগল মাচানের ওপরে। উপার্জন বলতে লছমনের দেওয়া নিষ্ফলা জমি থেকে কামধেনুর মতো বাৎসরিক উপার্জন 'শ'ছয়েক টাকা'। গল্পকার জানিয়েছেন, 'ও জমির আয়ে সব সময়টা চলে না। তখন বাপ ও দুই ছেলে জন খাটে, বনে যায় মেটে আলুর খোঁজে, তোহরি গিয়ে মাল টানে। মিশ্রজীর ফলবাগিচায় যায়।'

এ হেন পিছলেবর্গ শ্রেণির গঞ্জুকে নানা কৌশল করেই বেঁচে থাকতে হয়। আদিবাসী দরদী গল্পকার তার ছেলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, ''বাবা অত্যন্ত জটিল, অন্ধকার স্বভাবী, দুর্বোধ্য। গঞ্জুদের কাজ, মৃত পশুর চামড়া ছোলা। বাবা একবার দুর্ধর্ষ রাজপুত মহাজন, দশটা বন্দুকের মালিক লছমন সিংয়ের কয়েকটা মোষ মেরে ফেলে সেঁকো বিষ দিয়ে। লছমন সিংয়ের গ্রাম তামাডিতে বসে। তারপর চামড়া ছুলে বেচে দিয়ে আসে।''

'ছোটোলোক' দুলন গঞ্জু যে এরকম পৈশাচিক কাজ করতে পারে উচ্চবর্গের প্রতিনিধি লছমন সিং-এর ভাবনার মধ্যেই তা আসে না। সে উপলব্ধি করে এ কাজ তার চিরশত্রু শরিকি ভাই দৈতারি সিংয়ের ছাড়া কারো নয়। সেই থেকে দৈতারি সিংয়ের সঙ্গে লছমন সিং-এর বিবাদ আরো দৃঢ়তর ভাবে চলতে থাকে। এ হেন পিছলেবর্গ শ্রেণির প্রতিনিধি গঞ্জুর। ''চারিদিকে ওর রাজপুত জোতদার ও মহাজন টাহাড়ের হনুমান মিশ্র ব্রাহ্মণ। তিনি এ অঞ্চলে প্রভাবি মানুষ। এ হেন জায়গায় বাস ক'রে সর্বদা উচ্চবর্গের শাসনে থেকে, দুলনের কোমর ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।'' তাকে কৌশলে ও ছলচাতুরি করে উচ্চবর্গের মহাজন শ্রেণিদের বোকা বানিয়ে চলতে হয়। নয়ত তার বেঁচে থাকায় কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। গল্পকার তার দু'টি ছলচাতুরির পরিচয় দিয়েছে। প্রথমত, উচ্চবর্গের দৈতারি সিংয়ের বাড়িতে একটা কুমড়ো বেচে একবার দৈতারির বৌয়ের থেকে দাম নিলেও পরে আবার দৈতারির মা-এর থেকে দাম নেয়। দ্বিতীয়ত, ''লছমন সিংয়ের বাড়ি থেকে যখন ছট্ পরবের কলা-মূলো-সবজি-ফল গরুর গাড়িতে চাপিয়ে কুরুণ্ডা নদীর পারে আনা হয়, ও পাশে গিয়ে নিজেই সঙ্গে হাঁটে ও কাল্পনিক পাখি তাড়ায় চেঁচিয়ে এবং সমানে কিছু কিছু সরায়।''

এ হেন দুলন গঞ্জুকে বেঁচে থাকার নতুন নতুন কৌশল করেই বেঁচে থাকতে হয়। মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্ট বেশির ভাগ চরিত্রগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজেদেরকে সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত করে নতুন ভাবে বেঁচে থাকে। যারা তা পারে না কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। গঞ্জুকেও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার নতুন নতুন কৌশল ভেবে যেতে হয়। সমালোচক শর্মিলা বসু বলেছিলেন—

> ''বহুধাবিস্তৃত, ব্যাপক ও বিচিত্র' মহাশ্বেতা দেবীর লেখন পথের শেষতম ঠিকানা একটাই—তা হল মানুষ, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত নতুনতর ভাবে বেঁচে থাকা জলজীয়ন্ত মানুষ।''[৯]

ভারতবর্ষ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। মহাশ্বেতা দেবীর 'বর্তিকা পত্রিকা' প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> ''পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৮৪ শতাংশ ভূমিদাসই হল হরিজন ও আদিবাসী। আর মালিকদের মধ্যে মাত্র ৮.৪ শতাংশ হরিজন ও আদিবাসীরা। ন্যূনতম মজুরি বর্ণহিন্দু আর ভূমিদাসের মধ্যে হরিজনদের তুলনায় আদিবাসীরাই সর্বাধিক।''[১০]

এই পরিসংখ্যান থেকে উপলব্ধ হয় করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মতো ভূমিদাসরা ৮.৪ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগত দিক দিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু জোতদার মহাজন লছমন সিংয়ের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না। ধূর্ত লছমন যেমন নিষ্ফলা পাথুরে বন্ধ্যা-জমি দিয়ে যেমন সর্বোদয়ী মিশনের কর্মীদের মন রাখে, তেমনি দুলনকে সেই জমি চাষ করতে নিষেধ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষেরদের ঐ জমিতে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে লুকিয়ে রাখতে উক্ত জমিতে পুঁতে রাখতে নির্দেশ দেয়। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মীদের হাতে রাখতে ''বি.ডি.ও.-কে স্কুটার, দারোগাকে ট্রানজিস্টার কিনে দেয়।'' মৃত করণ ও বুলাকির নিজস্ব দেড় বিঘা জমিও পূর্ব-ঋণ দেখিয়ে দখল করে নেয়। অর্থনৈতিক শোষণের কদর্য রূপটি উচ্চবর্গের প্রতিনিধি লছমন সিং-এর শোষণের মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। ভূমিদাসদের ন্যায্য মজুরি না দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী হতে দেখা যায় তামাডির 'লড়াকু' করণ দুসাদকে। সে দুর্ধর্ষ লছমন সিংয়ের অসাগর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তার পাকা গম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তবে করণ দুসাদের এ প্রতিবাদ কোন সংগঠনের মদতে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিনের শোষণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাকে বিদ্রোহের পথে চালিত করে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লছমন সিংয়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে থাকে। সে বলে, ''আমাদের দাবি তো খুব সামান্য। আমরা হরিজন আর আদিবাসী। এই জংলা জায়গায় মজুরি পাব না। আট আনার লড়াইটাই করব। মেয়ে-মরদ-ছোট ছেলে মেয়ে সকলকে আট আনা করে দাও। চার আনাও দিচ্ছে। বাড়তি চার আনার জন্যে এ আমাদের 'পঁচিশ পয়সার লড়াই।' সুরেশচন্দ্র মৈত্র মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> ''তাঁর গল্পের বিদ্রোহী চরিত্র ও গোষ্ঠীগুলির আন্দোলন দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অসংখ্য আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ও বিচ্ছিন্ন যা শেষ অবধি সেই আন্দোলনকে কীভাবে শক্তিশালী করবে, এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।''[১১]

অন্ত্যজ জনজাতির দুলন গঞ্জুর মৃত চামড়া ছোলা কাজ হলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সে জানত করণ দুসাদের পক্ষে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী উচ্চবিত্ত লছমন সিংয়ের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তাই তাকে উপদেশ দেয় তোহরির আদিবাসী দফতর ও হরিজন সেবা সঙ্ঘের মদন লালজিকে জানিয়ে রাখতে। করণ দুসাদের আন্দোলনের ফলেই আদিবাসীরা তাদের মজুরি চার আনা বেড়ে আট আনা হয়। অর্থপিশাচ লছমন সিংয়ের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই বিদ্রোহ দমন করতে করণ দুসাদ ও বুলাকিকে হত্যা করে লোকচক্ষুর আড়ালে দুলনের জমিতে পোঁতে। গল্পকার মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন, উচ্চবর্গের মানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠরোধ করার জন্য চিরকাল নিম্নবিত্তের ওপর কদর্য পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখাননি। শকুন্তলা ভট্টাচার্য তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> ''এত সংযত, সোজাসুজি অথচ এত তীব্র রকমের জোরালোভাবে বক্তব্য পেশ করা বোধহয় সমসাময়িক আর কারোর মধ্যে দেখা যায় না।''[১২]

তবে আদিবাসী জীবনে প্রথম মজুরি নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তামাডির করণ দোসাদ যে পথদিশা দেখিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথকে পাথেয় করে আসরফি, মোহর, মহুবন, পারশ, ধাতুয়ারা মজুরি নিয়ে অর্থলোভী লছমন সিংয়ের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে চালিত করেছিল। তাদেরও শেষপর্যন্ত করুণ পরিণতি হয়েছিল করণ দোসাদের মতোই।

'বিছন' গল্পে উল্লেখিত উচ্চবর্গীয় জোতদার ভূস্বামী লছমন সিং হতমান নিম্নবর্গের ক্ষেতমজুরদের প্রাপ্য মজুরি থেকে কীভাবে বঞ্চিত করে চলে তা ছকের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হল—

প্রতিবাদী ক্ষেতমজুর	সরকারী নির্দেশানুযায়ী প্রাপ্য মজুরি	লছমন সিং কর্তৃক প্রদেয় মজুরি	প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত মজুরি	মজুরির জন্য প্রতিবাদ	প্রতিবাদের ফলে গৃহীত মজুরি	পরিণাম
করণ দুসাদ	পাঁচ টাকা আশি পয়সা	পঁচিশ পয়সা	পাঁচ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা	পঞ্চাশ পয়সা	আট আনা	মৃত্যু
আসরফি মাহাতো	পাঁচ টাকা আশি পয়সা	দু'টাকা	তিন টাকা	পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সা	দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা	মৃত্যু
ধাতুয়া গঞ্জু	পাঁচ টাকা আশি পয়সা	এক টাকা পঁচিশ পয়সা (পঁচিশ পয়সা মার্সেনারী অমর নাথকে প্রদেয়)	চার টাকা আশি পয়সা	এক টাকা পঁচিশ পয়সা	-	মৃত্যু

হতমান গঞ্জু, কৈরি, মাহাতো, দুসাদের মতো অন্ত্যজ উপজাতিদের দুঃখময় জীবনের কথা, মহাশ্বেতা দেবীর মতো করে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ ভাবেন না। করণ দুসাদ, আসরফি মাহাতো, ধাতুয়া গঞ্জুরা তাদের সরকার নির্ধারিত প্রাপ্য মজুরি থেকে সামান্য মজুরি বাড়ানোর প্রতিবাদ করলে, সেই আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য উচ্চবর্গের জোতদার মহাজন রাজপুত লছমন সিং তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

আদিবাসী খেতমজুররা যে শুধুমাত্র জোতদার মহাজন রাজপুতদের নিকট শোষিত হয়ে চলেছে তাই নয়, মস্তান ঠিকাদারদের নিকটও যে তারা শোষিত হয়ে চলেছে উক্ত বিষয়টিও গল্পকার এড়িয়ে যাননি। ''কাংগ্রেসী মস্তান লোগ বাইরের কিষাণ আনার ঠিকাদারী নিয়েছে। এবার খেলা আরো দুরন্ত মজার। প্রত্যেকের মজুরী থেকে উক্ত ঠিকাদারকে চার আনা দিন দিন দিতে হবে। ঠিকাদারের লোক হও বা না হও। উক্ত মস্তানরা কথা দিয়েছে, বন্দুক হাতে ওরা ফসল কাটিয়ে নেবে এবং যে ট্যাঁ-ফোঁ করবে, তার চামড়ায় পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে এ অঞ্চলে বদমায়েশি চিরতরে ঘোচাবে।''

ঠিকাদারেরা জোরজুলুম করে দীনদুঃখী ক্ষেতমজুরদের কষ্টকর পরিশ্রমসাধ্য প্রাপ্ত টাকার থেকে কমিশন আদায় করে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদারও ক্রমে পেশাদারী হয়ে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ পরিবর্তনের সঙ্গে পেশার নামটিও পরিবর্তন করে অসহায় ক্ষেত মজদুরদের ওপর শোষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ''দু'বছর আগে যে ছিল 'কাংগ্রেসী ও মস্তান' ডক্টরেট দুটি বাদ দিয়ে ক্ষেতমজুর জোগাবার ঠিকাদার হয়ে দেখা যায়। তার সঙ্গে তারই মত টেরিক্লথ শোভিত, কালো চশমা পরিহিত বন্দুক-উঁচানো সঙ্গী চতুষ্টয়। অমিতাভ বচ্চনের গলায় এই মার্সেনারি লছনকে, বলে আপনাদের দিন খতম এখন। স্ট্রাইক ভাঙা, ক্ষেতমজদুর যোগান দেওয়া ও ফসল কাটানো, সবই পেশাদারদের হাতে চলে এসেছে। সাউথ-ইস্টার্ন বিহারে আমি মার্সেনারি সার্ভিস দিই। আপনি না চাইলেও আমিই দেব। পাঁচ হাজার টাকা। আগাম।''

গল্পকার উচ্চবর্গের প্রতিনিধি টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের ভাতিজা অমর নাথকে শোষণকারী ভাড়াটে মার্সেনারী রূপে অঙ্কন করেছেন। তার শোষণে নিম্নবর্গীয় দুলন গঞ্জুর পুত্র খেতমজুর ধাতুয়ারা শোষিত হয়। তাই ধাতুয়ার নেতৃত্বে প্রাপ্য মজুরির জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

অর্থলোভী লছমন সিং দীনদুঃখী আদিবাসীদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে তাদের শোষণ করে চললে তাদের মনে সে যে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা প্রতিপন্ন করতে 'হনুমান মিশ্রের মন্দিরে শিবের মাথায় সোনার গোখরো সাপ গড়িয়ে দেয়।' আসরফি, মোহর, ধোবিয়ার নিখোঁজ মামলায় লছমন সিং বেকসুর খালাস পেলেও সৎ এস.ডি.ও. ডিমোটেড হলে ''লছমন ও অন্যান্য জোতদার-মহাজন হনুমান মিশ্রের মন্দিরে বর্বর ধুমধামে পুজো দেয়, রূপোর বিল্বপত্র একশো আটটি ঘোষণা করে....।'' আসলে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন, উচ্চবর্গীয় জোতদার-মহাজনেরা নিম্নবিত্তের ওপর অর্থনৈতিক

শোষণ করেও ধর্মীয় সংস্কারের মায়াজাল বিস্তার করে সহজ সরল নিরক্ষর আদিবাসীদের মন রাখতে সচেষ্ট হয়। ফলে অন্ত্যজ জনজাতির ওপর তাদের শোষণ করা আরও সুবিধে হয়।

সামাজিক অবস্থানে প্রান্তিক (Marginal) শ্রেণির প্রতিনিধি দুলন শেষ পর্যন্ত করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার হত্যার প্রতিশোধ নিতে ও তাদের ওপর শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে অত্যাচারী খুনী অর্থলোভী জোতদার মহাজন লছমন সিংকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। ক্ষমতাসীন লছমন সিংয়ের ক্ষমতা আস্ফালনের তথা কায়েম রাখার বিরুদ্ধে অন্ত্যজ উপজাতির দুলন গঞ্জুর কার্যকলাপ অন্যান্যদের থেকে ব্যতিক্রমী। এ দুলনের যেন রূপান্তর ঘটে গেছে। অত্যাচারী লছমনকে খুন করে তাদের ওপর অত্যাচারের ইতি ঘটান। এ দুলন আর পূর্বের অত্যাচার সহ্যকারী দুলন নয়, তার পুরো পরিবর্তন ঘটে গেছে। গল্পকারের বর্ণনায়, ''মাচান থেকে নেমে আসে এক প্রসন্ন নতুন দুলন।'' তাদের ওপর ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও অশুভ শক্তির ছায়া না পড়ে, তাদের যাতে অর্থলোভী শোষণকারী মানুষেরা আর শোষণ করতে না পারে, সেজন্য সে পহানের বাড়িতে সকলকে ডেকে তাদের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিতে প্রত্যেককে তার পরিশ্রম সাধ্য নিজের হাতে ফলানো ধানের জমির ধান বিছন করতে নির্দেশ দিয়েছে। ''আমার ধান তোমাদের লেগে বিছন। এই বিছন নাও। .... তোমরা কাট। আমাকেও চারটি দিও। আবার রুইব, আবার .... করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংস মজ্জার সারে পুষ্ট পাকা ধানে আশ্চর্য প্রচ্ছন্নতা। বিছন হবে বলে।''

এই বিছন দিয়ে প্রত্যেকে ধান উৎপন্ন করবে আবার সেই ধান থেকে আবার বিছন হবে। এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকবে। এইভাবে তাদের বিছন থেকে আবার ধান উৎপাদন করে খাদ্যের দিক থেকে সাবলম্বী হবে। তাদের ধানের বীজের আর অপ্রতুলতা হবে না। খাদ্যের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হয়ে আর তাদের থাকতে হবে না। তাদের গৃহে ধান থাকলে আর কোনও অশুভ শক্তি তাদের ওপর আর অত্যাচার চাপিয়ে দিতে পারবে না। তবেই তারা অর্থলোভী কুচক্রী শোষণকারী মানুষের আগ্রাসন তারা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তারা রুখে দিতে পারবে। তাদের বিছন প্রতিবাদী করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংস-মজ্জার সারে পুষ্ট। যাতে আছে আশ্চর্য প্রসন্নতা। তাদের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ এই বিছন। এই বিছন তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এই ভাবে আদিবাসী জীবনের প্রতি সহমর্মী মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদী মানুষের মাংস মজ্জায় পুষ্ট বিছনের মধ্য দিয়ে ঐক্যের এক বার্তা দিয়ে তাদের প্রতিরোধের পথকে সুগম করতে চেয়েছেন। তাদের ন্যায্য মজুরি বাড়ানোর জন্য করণ, আসরফি, ধাতুয়া প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি লছমন সিংয়ের বিরুদ্ধে। তারা লছমন সিংয়ের জমিতে স্বল্প মজুরির বিনিময়ে শ্রমদান করতে রাজী না হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। কিন্তু যে লছমন সিংয়ের ঘুষ দিয়ে প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতা তার করায়ত্ত, সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী লছমন সিংয়ের হাতে ফলস্বরূপ সহজ সরল নিষ্পাপ আদিবাসীদের তার সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয় না। তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাদের প্রাণহীন নশ্বর দেহ লোকচক্ষুর আড়াল করতে লোকালয় থেকে দূরে দুলন গঞ্জুর জমির নিচে লুকিয়ে রাখে। তাই করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংস-মজ্জার সারে পুষ্ট ধানের বিছনেই যেন নিম্নবিত্তের প্রতিবাদ লুকিয়ে রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে প্রতিবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন—

> ''আমার লেখাগুলির বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়েই আমার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসকে তুলে ধরতে পেরেছি বলে আমি মনে করব। প্রতিবাদের জন্য চিৎকৃত প্রতিবাদে আমার আস্থা নেই। আমার প্রতিটি লেখাতেই আমি তখনই প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তুলি, যখন প্রতিবাদের প্রেমিস থেকে শুদ্ধতর, আরো প্রয়োজনী কোনো প্রেমিসে উত্তরণ সূচিত করতে পারি।''[১৩]

'আবার রুইব আবার' শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে তাদের ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধান উৎপাদনের বার্তা দিয়ে, প্রভুত্ব শক্তির পরাজয় ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘবদ্ধ ঐক্যের বার্তা দিতে চেয়েছেন গল্পকার।

মহাশ্বেতা তাঁর বেশিরভাগ রচনাতে নিম্নবর্গীয় নারীচরিত্রকে বিদ্রোহিনী রূপে তুলে ধরে, পুরুষতান্ত্রিক ও উচ্চবর্গীয়

সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন।

> ''Throughout Mahasweta Devi's varied fiction, women's subjugation is portrayed as linked to the oppressions of caste and class. But in the best of her writing she quite brillantly, and with resonance Explores the articulation of class, cast, and gender in the specific situations she depicts.''[১৪]

তাঁর 'বিছন' গল্পটিও ব্যতিক্রমী নয়। আলোচ্য গল্পে দুলন গঞ্জুর স্ত্রী ওরফে ধাতুয়ার মা প্রান্তিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হলেও তার মধ্যে দিয়ে তিনি বিদ্রোহিনী রূপ অঙ্কন করে পুরুষতান্ত্রিক আদিবাসী সমাজে নারীদের বিশেষ সম্মান-রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। গঞ্জুর স্ত্রী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দীনদুঃখী হলেও তার উচ্চস্বরে স্বামীকে উদ্দেশ্যে গাল পাড়ার বিষয়টি পুরুষের প্রতি তার মাথা নত না করার দিকটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'ঝগড়া কোঁদলে ওর দক্ষ ও পেশাদারী কোঁদল ক্ষমতা' থাকার জন্য তার স্বজাতির লোকেরা এমনকি পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত তাকে বিশেষ সমীহ করে চলে। তার স্বগ্রাম তামাড়িতে হাঙ্গামা বাধলে তার ছেলে ধাতুয়াকে খুঁজতে আসলে সে ''পুলিশকে আগুন ছিটিয়ে গাল দিতে দিতে গ্রাম ছাড়িয়ে ছাড়ে।'' এমনকি সে অশিক্ষিত হলেও সুনিপুণ বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয়ও গল্পকার আড়াল করেননি। তার ছেলে ধাতুয়া পুলিশ থেকে বাঁচতে গোয়ালের মাচার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকলে; অপত্য স্নেহে ছেলেকে পুলিশের থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ''আয়, সব ঘর দেখ, আয় মড়াখেকোরা।'' সঙ্গে এও বলে ওঠে, ''দেখ, এখন গ্রামে পাবি শুধু বুড়ো বুড়ি আর ছেলে। তাদের দেখবি? তাদের ধরবি?'' তার চেঁচানিতে পুলিশ গ্রামটিকে নিরাপদ মনে করে রণে ভঙ্গ দেয়। পুলিশের প্রতি তার এ চিৎকার, এ প্রতিবাদ তার দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে। নিম্নবর্গীয় নারীর এ প্রতিবাদ তাকে সংগ্রামী নারীর মর্যাদায় উত্তীর্ণ করে। সংগ্রাম করেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। সন্তান বাৎসল্যতা, পাশাপাশি নারীত্বের মহিমায় উত্তীর্ণ অন্ত্যজ সমাজের এক অনন্য নারীকে পাই। পুলিশ চলে গেলে ভবিষ্যতে পুলিশের থেকে বাঁচার জন্য সুকৌশলী মতামত দেয় তার ছেলে ধাতুয়াকে, ''চিরকাল তোর আড়বুঝো বুদ্ধি! একটা বুড়িবকরির তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে। সে রাজপুত মহাজনের পায়ে টাঙি মেরেছিস, বেশ করেছিস। গলায় মারলর পাপ বিদেয় হত। তা পালাবি তো বনে? জঙ্গলে পালিয়ে থাকবি তো? গ্রামে ফেরে কোন্ বোকাটা? যা বনে যা।''

ধাতুয়া পিছলেবর্গ শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে উচ্চবর্গের রাজপুত মহাজনের পায়ে টাঙি মারাতে তার মা আপ্লুত হয়েছে। তাদের মতো অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের মানুষদের প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে যে, এইরকম প্রতিবাদের সঙ্গে কৌশল করেই বাঁচতে হবে—এটা ধাতুয়া তার মার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যা তাকে লছমন সিংয়ের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। গঞ্জুর স্ত্রী কথাবার্তা আচার আচরণে বিদ্রোহী মনোভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ বিদ্রোহ উচ্চবর্গের রাজপুর মহাজনদের প্রতি। যারা প্রতিনিয়ত উচ্চবর্গের থেকে অকথ্য অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। তাই ধাতুয়াকে বলেছে, 'রাজপুত মহাজনকে প্রাণে মেরে ফেললেই তাদের ওপর অত্যাচার বিদায় নিত।' অন্ত্যজ সমাজের দুলন গঞ্জুর স্ত্রীর এ প্রতিবাদ পুরুষতান্ত্রিক ও উচ্চবর্গীয় সমাজের প্রতি।

আদিবাসী শ্রেণি-সংগ্রামের ব্যর্থতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই ফিলানথ্রপি বা মানবদরদী গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটাননি। তিনি দুলন গঞ্জুকে দিয়ে করণ, আসরফি, ধাতুয়ার ন্যায্য দাবির সংগ্রামের পথ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শোষণকারী এলিট শ্রেণির প্রতিনিধি লছমন সিংহে হত্যা করে তাদের ওপর চলমান শোষণের অমোঘ নিয়মকে কিছুটা হলেও পরিবর্তনের একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন। দুলন গঞ্জুর মধ্য দিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রত্যাশাহীন আদিবাসী সমাজের অচলায়তনকে তিনি ভাঙার চেষ্টা দেখিয়েছেন। লছমন সিংয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদিবাসী দরদী গল্পকার এও দেখিয়েছেন, নিম্নবর্গের দুর্বল মানুষেরাও উচ্চবর্গের মানুষদের হত্যা করে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার বিনাশ করতে সক্ষম। পরিশেষে, আশাবাদের মধ্য দিয়েই আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ ঐক্যের দিতে চেয়েছেন, যে ঐক্য তাদের মধ্যে কালে কালান্তরে উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে চলতেই থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্তে (দশম মণ্ডলের নব্বইতম সূক্ত), ১০/৯০/১২।
২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ''ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস''; নিম্নবর্গের ইতিহাস' গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ৩।
৩. Encyclopedia of the Social Science, Vol. 15, 16, 17।
৪. Chambers Twentieth Century Dictionary, New Edition, 1972, P. 1343।
৫. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ. ১৯।
৬. রামেশ্বর শ্, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮০৩।
৭. মহাশ্বেতা দেবী, 'গণ্ডি ভাঙা মানুষ', শঙ্খ ঘোষ, 'সানন্দা', জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ৭৫।
৮. মহাশ্বেতা দেবীর 'শ্রেষ্ঠ গল্পে' ভূমিকা, ১৯৮৪।
৯. 'প্রমা' রজত সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪৩।
১০. মহাশ্বেতা দেবী ও নির্মল ঘোষ, 'ভারতে ভূমিদাস প্রথা', 'বর্তিকা পত্রিকা', ১৯৮০, পৃ. ৩৯।
১১. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, 'স্বর্ণাভ বাস্তবতা থেকে পিঙ্গল বাস্তবতা - মহিলা লেখিকা ঃ বাংলা ছোটগল্প', 'গল্পগুচ্ছ' শারদ ১৩৯৬, পৃ. ৩৯।
১২. শকুন্তলা ভট্টাচার্য, 'সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ঃ একটি ধারা', 'শারদ সমন্বয়', ১৯৯৬, পৃ. ১২৯।
১৩. 'এবং মুশায়েরা', জানুয়ারী ১৯৯৭।
১৪. "Women Writing in India', Voll, Edited by Susie Tharu and K. Lalita, The Feminist Press, New York, P. 235।

গল্পের সমস্ত উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী ১১০০৭০, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১১ থেকে।

অর্ঘ্য হালদার,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প : যুগ ও জীবনের জলছবি

কৃষ্ণা ঝুল্কী

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে এক বিশিষ্ট শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক হলেন সেলিনা হোসেন। উপন্যাস এবং ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন ও সমকালীন যুগের এক বিশ্বস্ত চিত্র অংকন করেছেন লেখিকা। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গল্প-উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল হল 'উৎস থেকে নিরন্তর', 'জলবতী মেঘের বাতাস', 'খোল করতাল', 'পরজন্ম', 'মতিজানের মেয়েরা', 'সখিনার চন্দ্রকলা', 'অবলার দিনক্ষণ' ইত্যাদি। অত্যন্ত মমতার সঙ্গে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বাংলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন, বেঁচে থাকার লড়াই, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলির এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেইসঙ্গে যুদ্ধ শেষে মূল্যবোধের অবক্ষয় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে।

'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পে কারখানার খেটে খাওয়া শ্রমিকদের নিপীড়িত জীবনের বিশ্বাসযোগ্য এক করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন লেখিকা। গল্পটিতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ, মালিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র, বিত্তবান দ্বারা হীনবিত্তের উপর শোষণ অত্যাচার—এই সবকিছুই অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে গল্পটিতে এসেছে। শ্রমিক সুরত আলীর নেতৃত্বে ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু হয়। কারখানায় খেটে খাওয়া মানুষগুলির খুব বেশি দাবি ছিল না তারা জেয়েছিল শুধু একটু ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে—

> "বাঁশির বেড়ায় আব্রু রক্ষা, কলতলার নোংরামির অবসান, ডাল-ভাতের বদলে মাছ-ভাত, কাপড়চোপড়ের একটু উন্নতি এইতো দাবি।"[১]

কারখানার এক সাধারণ শ্রমিক সুরত আলীর দেখা সুন্দর স্বপ্নগুলো ধুলিস্যাৎ করে মালিকপক্ষ তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার দোষ ছিল একটাই বস্তি জীবনের বাঁধাধরা ছক ভেঙে একটু নতুন পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানো, মানুষের না পাওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা আর কারখানার বিদ্রোহ। এই সবকিছু প্রতিহত করতে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। মিথ্যা মামলায় জেল হয় তার। জেলের মধ্য থেকেই সে নেতৃত্বহীন ধর্মঘটের ব্যর্থতা অনুভব করে। দীর্ঘ ছয় মাস পর বাড়িতে ফিরে এসে সন্তানসম্ভবা স্ত্রী ওজুফাকে দেখে তার সব কষ্ট দূরীভূত হলেও ওজুফার কাছে তার উপর হওয়া অত্যাচারের কাহিনী শুনে সুরত স্তমিত হয়। মালিকের মদ্যপ ছেলে তাহেরকে হত্যা করে বাড়ি ফিরে আসে এবং এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তার মন পরিবর্তিত হয়। তার স্ত্রীর প্রসব করা সন্তানকে তাহেরের জেনেও সে তাকে দুই হাতে কোলে তুলে নেয়। প্রতিশোধের হিসাব-নিকাশ তাহেরের সঙ্গে হলেও সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে ওজুফার আপত্তি সত্ত্বেও মানুষ করতে চেয়ে অন্য মানুষ হয়ে ওঠে সুরত আলী। সে অজুফকে বলে—

> "আমি ওকে মানুষ করবো ওজুফা। ও আমার ছেলে। তোর রক্ত আছে ওর গায়ে—ও তোর ছেলে—ও মানুষের ছেলে। আমি আর কিছু জানতে চাই না-ও আমাও আমার ও আমার।"[২]

এক বাস্তব জীবনের ছবি অংকন করলেন লেখিকা। মালিকশ্রেণি নিজের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণিকে চিরকাল অবদমিত করেছে, সেখানে কোনো ন্যায়-নীতি, ধর্ম-অধর্ম কাজ করেনি। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে, দরিদ্র অসহায় মানুষকে তাদের জায়গা বারেবারে মালিকপক্ষ বুঝিয়ে দিয়েছে কিন্তু স্ত্রীর উপরে হওয়ার এত বড় অন্যায়ের প্রতিশোধ মালিকের

ঝুল্কী, কৃষ্ণা : সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প ঃ যুগ ও জীবনের জলছবি
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 21-27, ISSN 2249-4332

ছেলে তাহেরকে হত্যা করে সুরত নিলেও সন্তানের কোনো ক্ষতি সে করতে পারেনি তার পিতৃসুলভ মনোভাবের জন্যই। এখানেই গল্পটি হয়ে উঠেছে অনন্য।

'পরজন্ম' গল্পে উঠে এসেছে স্ত্রীপুত্রহারা এক অসহায় বৃদ্ধের যাপন চিত্র। চার বীর পুত্রের মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদান বারে বারে বৃদ্ধ কাজেম আলীকে ব্যথাতুর করে তোলে। একাকিত্বের বেদনা আর জোয়ান পুত্রদের স্মৃতি তার হৃদয় তোলপাড় করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই একই দিনে চারপুত্র মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারায়। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে চেয়ে নিজেদের জীবনের কোনো মূল্যই তাদের কাছে থাকেনা। বাপ-মায়ের সামনে মিলিটারির গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া পুত্রদের কথা সে কখনোই ভুলতে পারে না। শহীদদের বাড়ি বলে খ্যাত তার নিজের বাড়ি তার কাছে মন্দিরের মতো, সেই ভিটে অন্ধকার হয়ে থাকবে তা কখনই কাজেম মেনে নিতে পারে না। তার একটাই আক্ষেপ থেকে যায়—চার পুরুষের ভিটেমাটি আর পাঁচ পুরুষ হল না। শূন্য ভিটেতে অন্য কোন আত্মীয়কে কাজেম থাকতে দিতে চায় না, অন্য বংশের হাতে সে কিছুতেই তার সবকিছু সঁপে দিতে পারেনা। সিকান্দারের কথায় কাজেম বলে—

"আমার ভিটেতে পরের জায়গা ন্যাই।"

শেষ পর্যন্ত সিকান্দারের চেষ্টায় কাজেমের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কাজেম নির্দ্বিধায় বলে—

"সিকান্দার হামি ক্যাবল বউ চ্যাই না, হামার শাবকের মা চ্যাই। শক্ত-সমর্থ মানুষ চ্যাই।"[৩]

এইভাবে পাঁচ পুরুষের স্বপ্ন সার্থক করতে চায় কাজেম। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব বৃদ্ধকে একেবারে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলতে পারেনি, দেশ স্বাধীন হবার পর একাই সেই ভিটেমাটিতে থেকেছে।

লেখিকা খেটে খাওয়া মানুষের স্বপ্নকে এইভাবে সার্থকতার দিকে নিয়ে যান। বৃদ্ধ বয়সে কাজেম আবার নতুন করে সবকিছু গড়ার স্বপ্ন দেখে। বীর শহীদদের পিতা সে, ভয়ে পিছিয়ে আসার কোনো ভাবনা কাজেমকে একেবারে শেষ করে দেয় না, নতুন করে ভাবতে গিয়ে স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি আবার যেন সে খুঁজে পায়। কুলসুমকে বিবাহের দিন একটিমাত্র ইচ্ছের কথা কাজেম জানায় তাকে—

"হামার ভিটেত পাঁচ পুরুষের পত্তন চ্যাই। হামি ভিটা আন্ধার র‍্যাখা মরব্যার প্যারমো না।"[৪]

'যুদ্ধজয়' গল্পে দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন দেখা যুদ্ধে আহত বীর যুবকদের জীবন যুদ্ধের কাহিনি লিখেছেন গল্পকার। স্বাধীনদেশের স্বপ্নে বিভোর দশজন তরুণ চিকিৎসা করতে এসে বাড়ির সমস্ত মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যায়। এক গভীর শূন্যতা, অবসাদ সকলকে গ্রাস করে। পরাধীন দেশের জন্য একদা এগিয়ে আসা তরুণদের কেউই মনে রাখে না। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—

"কেবলই মনে হয় দেশের জন্য যুদ্ধ মানে কি এমন নিদারুণ নির্বাসন।"[৫]

দেশ স্বাধীনের পরেও এই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পরিবার এবং দেশের অবহেলাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। অসুস্থ এই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে সকলের কাছে।

সেলিনা হোসেনের গল্পে রয়েছে সত্যের অনুসন্ধান। সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র, লুণ্ঠন, স্বৈরাচার, শাসকদলের নির্মম অত্যাচার, সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটের এক জীবন্ত বাস্তবচিত্র অংকিত হয়েছে লেখিকার নির্ভীক কলমে। মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে জনসাধারণের বিক্ষোভ, স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তাদের লড়াই এবং স্বাধীনতাপরবর্তী আশাভঙ্গের দিকটি ফুটে উঠেছে বিভিন্ন গল্পে।

বেশকিছু গল্পে উঠে এসেছে সময়ের চিত্র। জীবনের জলছবি যেন পাতায় পাতায় ধরা পড়েছে। 'মানুষটি' একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে গল্পটি রচিত হয়েছে। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্বে জনবিক্ষোভ, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা —এই অস্থিরতার ছবি মানুষ চরিত্রটির মধ্যে

দেখিয়েছেন লেখিকা। সংসারে মা-বাবা, স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে মানুষটির ভালোবাসার সেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও এই নিয়ে মানুষটির কোনো আক্ষেপ নেই, রবীন্দ্রনাথ একমাত্র তাঁর জীবনের আশ্রয়স্থল। মানুষটির সাময়িক আচরণ অন্যদের কাছে অস্বস্তির কারণ হলেও মানুষটি এই বিষয়ে নিজের কোন দোষ দেখতে পায় না।

> "পরিচিতজন কিংবা সহকর্মীরা কেউ কেউ মনে করে মানুষটি অমায়িক, কেউ মনে করে অহংকারী, দেমাগি।"[৬]

নিজের কাছে পরিষ্কার থাকা মানুষটি তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বেঁচে থাকে। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখিকা যুগজীবনের এক ছবি অঙ্কন করেছেন।

নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গ যেমন বেশকিছু গল্পে এসেছে তেমনি কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনও নীরবে প্রতিবাদ করেছে তারা। 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পের মতিজান, 'পারুলের মা হওয়া' গল্পের পারুল, চেনা জগৎ এর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ-সংসারের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে ভাবনার চিন্তা করেছে।

'মতিজানের মেয়েরা' গল্পে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের বউ হয়ে আসা মতিজান নেশাগ্রস্ত পরস্ত্রীতে আসক্ত স্বামীকে কখনই নিজের করে পায় না, অন্যদিকে শাশুড়িও তাকে আপন করে নিতে পারে না। বংশ রক্ষার জন্য শাশুড়ির তাগিদ থাকলেও আবুল রাজি হয় না। পনের জন্য শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত মতিজান নিজেকে ধীরে ধীরে শক্ত করে, মা হতে না পারার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়। শেষ পর্যন্ত স্বামীর বন্ধু লোকমানের ঔরসে তার গর্ভে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র সন্তান না হওয়ায় শাশুড়ি তাকে তালাক দেওয়ার কথা বললে, উঠোনের ভরা লোকজনের মাঝে হাসতে হাসতে মতিজান বলে—

> "বংশের বাত্তি? থু:! আপনের ছাওয়ালের আশায় থাকলে হামি ই মাইয়া দুইডাও পেত্যামনা।"[৭]

গ্রামের শক্ত মেয়ে মতিজানের শাশুড়ি গুলনুর মতিজানের এই স্বীকারোক্তিতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'পারুলের মা হওয়া' গল্পে পারুলও স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে অন্য এক দৃঢ়সংকল্প নারীতে পরিণত হয়েছে। স্বামী অন্য নারীকে বিবাহ করলে সে নিজে স্বাধীনভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন পারুল অনুভব করে সে মা হতে যাচ্ছে। স্বামী ছাড়া মা হওয়া ভাল না মন্দ সেই বোধ তার মধ্যে কাজ করে না। তারার মা এই বিষয়টি পারুলকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয়—

> "বাপ লাইগব কিসের লাই আঁই বাপ আঁই মা।"[৮]

পারুলের ভাবনাচিন্তা আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতো নয়, আঘাত পেতে পেতে সমাজকেও সে কিছু ফেরাতে চায়। লেখিকা তার ভাবনাকে উন্মোচিত করলেন—

> "শরীরের দাবি মেটানোর জন্য ওর যাকে পছন্দ হয় তাকেই প্রশ্রয় দেয়। যার সঙ্গ ওর ভালো লাগে সেটা ওর আনন্দ—সন্তানের পিতা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। ও পিতৃত্বের অধিকার দিতেও চায় না।"[৯]

পারুলের সন্তানের পিতৃপরিচয় গোপন থাকে এমনকি সেই অনাগতের পিতৃপরিচয় জানতে আসা একে একে সব লোককে সে ফিরিয়ে দেয়। এখানেই অন্য নারীর সঙ্গে পারুলের স্বাতন্ত্র্যতা। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সে একেবারে স্বাধীনসত্ত্বায় উদ্ভাসিত। সে জানে 'পুরুষ মানুষ গুলো পিতৃত্বের পরিচয় চায় আর কিছু চায় না।"[১০] এইভাবে পারুলের মধ্যে এক স্বাধীন দৃঢ় মানসিকতার আধুনিক নারীর সন্ধান মেলে।

পণপ্রথার এক নির্মম ছবি 'কুন্তলার অন্ধকার' গল্পটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা আর অন্যদিকে স্বামীর অত্যাচার শিউলিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শত অত্যাচার সহ্য করেও শিউলি বাপের বাড়ি থেকে

টাকা আনতে চায় না, এর ফল হয় মারাত্মক। তাদের ছোট্ট মেয়ে কুন্তলা একদিন দেখতে পায় তার মায়ের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তার বাবা তাকে মেরে ফেলেছে। বাড়িতে পুলিশ এলে কুন্তলা সব সত্যি কথা পুলিশকে বলে দেয়, এইভাবে সামাজিক সংকটের এক নির্মম বাস্তব ছবি গল্পটিতে অংকন করেছেন লেখিকা।

'বাড়ি ফেরা' গল্পে উঠে এসেছে ধর্ষণের মতো এক সামাজিক ব্যাধির প্রসঙ্গ। শহরের হাসপাতাল থেকে অসুস্থ বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় ধর্ষিত হয় মেখলা। শেষপর্যন্ত ভোরের রাতে পুনরায় আসা এক যুবককে ইঁটের আঘাতে সে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। চিরকাল ভোগ্যপণ্য নারীও যে তার অসম্মানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে তা মেঘলা চরিত্রটি প্রমাম করে। এমনকি দুবৃত্তদের হাত থেকে তার বাবাও তাকে রক্ষার চেষ্টা করে না। পিতার সামনে কন্যার এই অপমান সত্যিই বেদনা দায়ক। এই পরিস্থিতিতে একাই সব সিদ্ধান্ত নেয় মেঘলা। সামাজিক ব্যাধি দূর করা কঠিন হলেও মেঘলা একাই সেই লড়াইয়ে নামে। যুগোপযোগী গল্প এটি।

'আকালির স্টেশন জীবন' গল্পে একদা ধর্ষিতা আকালির রাতের অন্ধকারে শুরু হয় স্টেশনের জীবন। পুরুষদের খুশি করাই তার উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। লেখিকা নারীজীবনের করুণ ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। কিন্তু সেই জীবন থেকে উত্তরণের কোনো রাস্তাই খোলা থাকে না আকালির জন্য। একটা সময়কে এখানে ধরেছেন লেখিকা।

এক সামাজিক সংকট এর গল্প 'অনূঢ়া পূর্ণিমা'। সমাজের পতিতার কোন স্থান হয় না। তাকে যেমন ভালোবাসা যায় না তেমনই তাকে নিয়ে সংসারও করা যায় না। অনূঢ়া পূর্ণিমা তিথিতে অনূঢ়া ভেবে লীলাকে আপন করে নেওয়া পুরুষটি যখন জানতে পারল যে লীলা নিষিদ্ধ পল্লীতে পতিতাবৃত্তি করে তখন তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দেয়। অসহায় পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে লীলা পতিতা কিন্তু এই প্রথম রাস মেলায় এসে কাউকে সে ভালোবেসে দেহ দিলেও ব্রাত্যই থেকে যায়। লীলার মত মেয়েদের যে কোনো স্বপ্ন দেখতে নেই বা থাকতে পারেনা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গল্পটিতে।

'মর্গ' গল্পটিতে আরো এক সামাজিক সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। গর্ভবতী কুমারী পূর্ণিমা শচীন্দ্রর নিকট সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। তাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়ে শচীন্দ্র তাকে হত্যা করে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক গ্রাম্য সহজ সরল মেয়েকে ঠকানো এক সামাজিক ব্যাধি। অপরাধী সমাজে অপরাধ করেও ঘুরে বেড়ায়। শচীন্দ্র পূর্ণিমার পরনের শাড়ি গলায় জড়িয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। লাশকাটা ঘরে পড়ে থাকে পূর্ণিমার দেহ। তদন্তের পূর্বে পুলিশের অমানবিকতা ফুটে ওঠে গল্পটিতে। লাশ নামানোর পর সমত্ত যুবতীকে লাথি মেরে পুলিশটা বলেছে 'হারামজাদি মরার আর জায়গা পেল না।' মর্গে রাখা কাটাছেঁড়া শিয়াল শুয়োরের খুবলে খাওয়া পূর্ণিমার দেহ দেখে ক্রুদ্ধ শিশুরা একজোট হয়ে ভাঙ্গা মর্গের বিরুদ্ধে মিছিল করে হাসপাতাল চত্বরে এসে শ্লোগান দেয়—

"মর্গ ঠিক করো নইলে হাতপাতাল ছাড়ো" আর চিৎকার করে বলে "পুর্ণিমা হত্যার বিচার চাই"[১১] বড় বড় রাজনীতিবিদদের মত ছোট শিশুরাও যেন পরিস্থিতিকে অনুভব করে রাজনৈতিক দলের মতো পূর্ণিমা হত্যার ইস্যু তৈরি করে। তারা অজান্তেই সাধারণ জনগণকে সতর্ক করে এইভাবে লেখিকা জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

বাস্তব জীবন এবং সমাজ সংকটের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র লক্ষ্য করা যায় 'খরা' গল্পটির মধ্য দিয়ে। সংসারে নারীর উপর উৎপীড়ন, অন্য নারীতে আসক্ত পুরুষ, মায়ের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে খুনি পুত্রের সন্ত্রাসবাদী অন্ধকার জীবন, সন্ত্রাসীদের সাহায্য করা ভিআইপি—এই সবকিছু মিলিয়ে গল্পটিতে সামাজিক সংকট আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এক তরুণের জীবনের সব স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকা তার অত্যাচারিত মায়ের মুখ তাকে আরো বেশি কঠোর করে তোলে। শেষপর্যন্ত একটিমাত্র বুলেটে শেষ হয়ে যায় যুবকটির জীবন। এইভাবে গল্পের মধ্যে বাংলাদেশের সন্ত্রাসের দিকে আলোকপাত করেছেন লেখিকা। 'একালের পান্থা বুড়ি' গল্পেও

সমকালীন সন্ত্রাসীদের অত্যাচারের চিত্র মেলে। প্রাণ নেওয়া তাদের কাছে খেলা মাত্র। দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের উপর উৎপীড়ন আর ক্ষমতাবানের আরো ক্ষমতালিপ্সা ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে মানুষকে। ধর্ষণ আর হত্যার মতো অপরাধ করেও অপরাধী দাপিয়ে বেড়ায় সমাজের বুকে।

ঢাকা শহরের এক ঘৃণ্য ছবি ফুটে উঠেছে 'অরণ্য কুসুম' নামক গল্পে। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা দিনমজুরের ধর্ষিতা মেয়েটি ঢাকায় আসে আশ্রয়ের খোঁজে, সেখানে এসে বারে বারে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা ধর্ষিত হয় সে। মেয়েটি অনুভব করে শরীরের চেয়ে টাকার মূল্য বেশি আর যে বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে সে নিজের গ্রাম ছেড়েছিল সেই বেঁচে থাকা চলে শুধু তার শরীরের বিনিময়ে, তার 'মানুষ দেখতে ঘেন্না লাগে।" এইভাবে দিনের পর দিন শারীরিক আর মানসিক অত্যাচারের শিকার হয় সে। মেয়েটির মনে হয়—"ও এখন মরা গাঙ। জীবনের নব্বই ভাগ পলি পড়ে বুজে গেছে, ওই পলি আর সরবে না।"[১২]

একসময় নীল পূর্ণিমার রাতে যমজ সন্তানের জননী হয় মেয়েটি। তখন সেই মেয়েটির চোখে নোংরা আস্তাবলে পরিণত হওয়া ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো যেন সুন্দর মনে হয়। এইভাবে লেখিকা ঢাকা শহরের এক অন্ধকারময় দিককে গল্পটির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের ছবি রয়েছে 'বনভূমি' গল্পে। সরকারি সেনাবাহিনী ও স্থানীয় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা পার্বত্য গ্রামের মেয়েরা প্রতিদিন লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছে, এই সবকিছুর প্রতিবাদে চন্দনার নেতৃত্বে বনভূমির মানুষ গর্জে ওঠে 'মুক্তি চাই'। প্রতিবাদী চন্দনা গ্রামের মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। আবার সবাই তাদের সেই স্বাধীন ভূমির স্বপ্ন দেখে—

> "মেয়েটা আমাদের ভরসা ... আমাদের হয়তো দেখা হবে না, কিন্তু আমাদের নাতিপুতিরা ঠিকই দেখবে যে এই গ্রামগুলো আবার আমাদেরই হয়েছে আমরাই সব ভূমির মালিক।"[১৩]

শেষপর্যন্ত চন্দনার পরিণতিও অন্য নারীর মত হয়। পাকিস্তানি সেনা আর স্বাধীনতাবিরোধী মানুষের দল চন্দনার ওপর নৃশংস অত্যাচার করে। এইভাবে লেখিকা স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশ এবং সেই সময়ের মানুষের জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারই নৃশংস করুণ কাহিনী 'রহমত আলীর শকুন' দেখা গল্পটি। দেশ স্বাধীন করতে চেয়ে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ মিনহাজ উদ্দিনও একদিন হয়ে ওঠে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। গেরিলা অপারশেন এ এসে মিলিটারির হাতে ধরা পড়া মিনহাজ উদ্দিন এর উপরে চলে অকথ্য অত্যাচার আর রাজাকার রহমত আলী ষড়যন্ত্র করে তার স্ত্রীকে তুলে দেয় মিলিটারিদের হাতে। ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা বকেয়ার শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু।

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে ক্রমশ গ্রাস করা দুর্নীতিকে লেখিকা দেখিয়েছেন 'দুর্নীতি' গল্পে। সাধারণ ঘরের বউ হয়ে আসা পুলিশ অফিসারের মেয়ে আফরোজা স্বামীকে বেশি উপার্জনের জন্য প্রায় মানসিকভাবে নির্যাতন শুরু করে কিন্তু ঘুষ নিয়ে অত্যধিক উপার্জনের বিরোধিতা করে শেষপর্যন্ত এই জাল ছিন্ন করে নিয়ামত বেরোতে চায়। সমাজ সংকটের সাথে দাম্পত্য সঙ্কটের এই সমস্যা গল্পটিতে প্রধান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রাজাকারদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার। 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে লেখিকা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী ছাত্র বাশারের বোমার আঘাতে মৃত্যু, মৌলবাদী নিপাত যাওয়ার স্লোগান, ব্রাহ্মণকন্যা মন্দিরার উপর চার যুবকের নৃশংস অত্যাচার। যুবকগুলি পরে তাদের ভুল বুঝতে পারলেও মূল্যবোধের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটিতে।

'সখিনার চন্দ্রকলা' গল্পগ্রন্থের আর একটি বিশিষ্ট গল্প হলো 'সখিনার চন্দ্রকলা'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা গল্পটিতে রয়েছে সাধারণ মানুষের উপরে পাকিস্তানি সেনা ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজ্যকারদের অত্যাচারের কাহিনী। গ্রামের নারী সখিনা নিজে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা অত্যাচারিত হলেও গ্রামের অন্যান্য নারী-পুরুষকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তার সর্বাধিক রাগ রাজাকার সুলেমান এর উপর। এই সুলেমান

নারীদের পাকিস্তানি মিলিটারি সৈন্যদের শিবিরে পৌঁছে দেয় ভোগের জন্য। এই মুক্তিযুদ্ধে সখিনা একজন প্রতিবাদী নারী এবং গ্রামের ধাত্রীও বটে। যে সকল মেয়েরা মিলিটারিদের অত্যাচারে গর্ভবতী হয় তাদের প্রসব করার জন্য ডাক পরে তার। সখিনার স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে স্বামীর ঘরে আর ফিরে যায় নি সে। তার এই প্রতিবাদিনীসত্তা তাকে এক স্বতন্ত্র নারীতে রূপান্তরিত করেছে। পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করে সখিনা দা দিয়ে পাঁচজন রাজাকারকে একাই হত্যা করে এমনকি হাতে দা নিয়ে রাজাকার সুলেমানকে পর্যন্ত সে হত্যা করতে চেয়ে সমস্ত নারীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। যুদ্ধে যাবার আগে আকবর আলীর স্ত্রীকে প্রসব করায় সে, আর একটা সত্যি কথা আতুর ঘর থেকে চিৎকার করে বলে—

> "চাঁদের মতো ফুটফুইট্টা মাইয়া মিলিটারি আর রাজাকারর দেখলে অহনই লইয়া যাইব কইব এই দ্যাশে এমন খুবসুরত মাইয়া ডলনের লাইগা আর পাই নাই।"[১৪]

স্বাধীনতা এলেও রাজাকাররা বেঁচে থাকে বলে সখিনার মনে কোন আনন্দ বা শান্তি থাকে না। তার প্রধান আরেকটি কাজ হল ধর্ষিতা কুমারী মেয়েদের গর্ভ খালাস করা কিন্তু তার একটি প্রধান শর্ত ছিল এই সকল সন্তানকে তাকে দিতে হবে। শুরু হয় তার এক নতুন যুদ্ধ। এইভাবে গল্পটি শেষ হয়। চন্দ্রকলার মত সাহস ও শক্তির বিস্তার গল্পের নামকরণে এক ব্যঞ্জনা এনে দেয়, সেইসঙ্গে সেইসময়ের এক বিশ্বস্ত চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় গল্পটিতে। 'মা মেয়ের যুদ্ধ' গল্পে রয়েছে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক যুদ্ধের প্রসঙ্গ, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারির সৈন্যদের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার আর স্বাধীনতা-পরবর্তী আরো এক যুদ্ধের গল্প। পাক সেনার হাতে মুক্তিযোদ্ধা খয়ের মিয়া ও তার মায়ের মৃত্যু আর তার স্ত্রী জরিবানুর উপর পাকিস্তানি মিলিটারিদের অত্যাচার একটা পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মিলিটারি ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হয় জরিবানু। এরপর বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আসে, জরিবানুও তার পরিবারের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে রাজাকারের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে শহীদের গুলি খাওয়া মেয়ে সুপিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে শুরু হয় তার আরো এক অন্য লড়াই কিন্তু স্বাধীন দেশেও শান্তিতে থাকতে পারে না সে, সবাই তাকে ভোগ করতে চায়।

> "জরিবানু দরজা খোল বিশ টাকা দিমু ... দরজা খোল হারামজাদী।"[১৫]

অসহায় এক নারীর একাকিত্বের সুযোগ নিতে গভীর রাতে ভেসে আসে পুরুষের খিস্তি, দুঃখে অপমানে জরিবানু জর্জরিত হয়। লেখিকার মনে প্রশ্ন জাগে 'স্বাধীন দেশে এই তার পাওনা হয়েছে?'

এরপর মা-মেয়ে স্বপ্ন দেখে আবার যদি আরো একটা যুদ্ধ হয় তারা দুজন মিলে যুদ্ধ করবে কিন্তু সাংবাদিকরা এসে যখন তাদের সম্মান জানায়, তখন দুজনে হি হি করে হাসতে থাকে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সমাজ সংসার মানুষের প্রতি দুঃখ-ক্ষোভ-ব্যঙ্গ গল্পটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরে সামাজিক জীবনের এক বাস্তব ছবি গল্পটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গভীর সংবেদী এক লেখিকা হলেন সেলিনা হোসেন। সমাজ সমস্যা ও সংকটের বিভিন্ন দিক তাঁর গল্পের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। বাস্তববাদী লেখিকা আবেগের দোলায় না ভেসে প্রকৃত সত্য এবং সমস্যাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সমস্যাগুলি বেশিরভাগ গল্পে এসেছে, সেই সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট অনেক ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে। লেখিকার গল্পের ভাষাও হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ ও যুগোপযোগী।

উৎস সন্ধানে:

আকর গ্রন্থ:

সেলিনা হোসেন : 'গল্প সংগ্রহ' এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৩

১. 'উৎস থেকে নিরন্তর', পৃ. ৩৮।
২. তদেব, পৃ. ৪০।
৩. 'পরজন্ম', পৃ. ১০২।
৪. তদেব, পৃ. ১০৪।
৫. 'যুদ্ধজয়', পৃ. ১০৭।
৬. 'মানুষটি', পৃ. ১৩৪।
৭. 'মতিজানের মেয়েরা', পৃ. ১৭১।
৮. 'পারুলের মা হওয়া', পৃ. ১৮৯।
৯. তদেব, পৃ. ১৮৯।
১০. তদেব, পৃ. ১৯০।
১১. 'মর্গ', পৃ. ২৩১।
১২. 'অরণ্যকুসুম', পৃ. ৩১০।
১৩. 'বনভূমি', পৃ. ২৭৮।
১৪. 'সখিনার চন্দ্রকলা', পৃ. ৩৪০।
১৫. 'মা-মেয়ের যুদ্ধ', পৃ. ৩৮০।

কৃষ্ণা ঝুল্কী
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
কাঁচরাপাড়া কলেজ

হাংরি কবিতার বিষয় ঃ একটি পর্যালোচনা

শিউলি বসাক

সময়টা ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস। প্রকাশিত হয় একটি বুলেটিন, নাম 'হাংরি জেনারেশন'। এটি ছিল তিন কলমে ডবলক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা বুলেটিন, বার্জাস টাইপে ছাপা—স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্বে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা দেবী রায়।[১] উল্লেখ্য ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসের আগেও হাংরিদের বুলেটিন বেরিয়েছে, তবে তা ইংরেজিতে ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে।[২] ইংরেজিতে প্রকাশের কারণ হল মলয় রায়চৌধুরী তখন পাটনায় থাকতেন, এবং সেখানে কোনো বাংলা প্রেস ছিল না। পরে বাংলা ভাষায় প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশিত হয়েছিল হাওড়া থেকে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে। ক্রমপ্রসারিত এই আন্দোলনের অষ্টম বুলেটিনের (যেটিতে প্রকাশিত হয়েছিল মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি) সমস্ত লেখককে অভিযুক্ত করে কলকাতা পুলিশ ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বুলেটিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় 'obscene' এবং 'unauthorised' বলে।[৩] প্রথম পর্বের হাংরি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এখানেই। এরপর দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন শুরু হয় মুখপত্ররূপ পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত'কে কেন্দ্র করে, যার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ। মোট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সাতটি—

১. 'ক্ষুধার্ত' প্রথম সংকলন, ১৩৭৬	সম্পাদক - বাসুদেব দাশগুপ্ত
২. 'ক্ষুধার্ত' দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৭২-১৯৭৩	সম্পাদক - সুভাষ ঘোষ
৩. 'ক্ষুধার্ত' তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫	সম্পাদক - প্রদীপ চৌধুরী
৪. 'ক্ষুধার্ত' চতুর্থ সংকলন, মার্চ ১৯৭৭	সম্পাদক - শৈলেশ্বর ঘোষ
৫. 'ক্ষুধার্ত' পঞ্চম সংকলন, মে ১৯৭৮	সম্পাদক - শৈলেশ্বর ঘোষ
৬. 'ক্ষুধার্ত' ষষ্ঠ সংকলন, নভেম্বর ১৯৮১	সম্পাদক - শৈলেশ্বর ঘোষ
৭. 'ক্ষুধার্ত' সপ্তম সংকলন, মে ১৯৮৪	সম্পাদক - শৈলেশ্বর ঘোষ

হাংরিদের জন্মকাল থেকেই বলা হয়ে আসছে যে, তাঁদের লেখালেখির বিষয় হল যৌনতা তথা অশ্লীলতা। প্রথমত, যৌনতা কখনও বিষয় হতে পারে না; তবে কোনো বিষয়ের মধ্যে 'যৌনতা' বা 'অশ্লীলতা'—এই বিশেষ গুণ বা দোষ যা'ই বলা হোক না কেন, তা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যাঁরা হাংরিদের লেখালেখির বিষয় হিসেবে যৌনতাকে বুঝেছেন বা বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'প্রতিষ্ঠানে'র ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত বা বলা যায় এস্টাবলিশমেন্টের মদতপুষ্ট খ্যাতনামা লেখক-আলোচক-সমালোচক-বুদ্ধিজীবী (হাংরিদের ভাষায় এস্টাবলিশমেন্টের চাকর), এছাড়া আরও এক শ্রেণির সমালোচক যারা হাংরি লেখা ভালো করে না পড়েই হাংরি লেখার সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। মলয় রায়চৌধুরী ইংরেজিতে প্রথম যে বুলেটিনটি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬১-তে, তা থেকে খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় যে হাংরিদের লেখালেখির বিষয় ছিল "The merciless exposure of the self in its entirety."[৪] অর্থাৎ সামগ্রিক আত্মোন্মোচন। তাই নিজের মূল খোঁজার প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায় তাঁদের লেখায়। তাঁরা মনে করতেন আমাদের জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হয়ে যায় যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের আসল অর্থটাই না জানি, যদি জানতে না পারি আমি কে এবং এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু কণা, প্রতিটি প্রাণের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারি।[৫] সুবো আচার্য 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ'তে বলেছিলেন,

বসাক, শিউলি : হাংরি কবিতার বিষয় ঃ একটি পর্যালোচনা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 28-39, ISSN 2249-4332

''কতোদিন বেঁচে আছি অথচ আজও জানি না কেন বেঁচে আছি / কী চাই আমি তা জানি না।''[৬] তাই তাঁরা বারবার বুঝতে চেয়েছেন নিজেকে, নিজের সঙ্গে এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকণার সম্পর্ককে। 'merciless' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে শৈলেশ্বর ঘোষও 'আমার পেছনে কে?' কবিতায় বলেছিলেন ''আত্মার জন্য কোনো আইন মানি না আমি।''[৭] নিজের অস্তিত্বের মূলকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন একদম আদিতে—শুক্রে, ডিম্বাণুতে এবং আমাদের জন্ম-প্রক্রিয়ায়। মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন, ''এত মানুষ, এত শুক্র; আমি পড়েছি, শুক্রকীট। শুক্রকীটই সব, দলদল শুক্র। আমার ষোলো বছরের শুক্রটি আমি, আমার বাবার দেওয়া শুক্রকীট।''[৮] এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ নিছক 'যৌনতা' বা 'অশ্লীলতা'র তকমা দিয়ে দেগে দিতেই পারেন; সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের জন্মটাই অশ্লীল হয়ে পড়ে। ফালগুনি রায় 'আমার বাইবেল আমার রাইফেল' কবিতায় বলছেন, ''শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ে কেউ পুণ্য সঞ্চয় করে—কেউ ভাইবোনের / যৌনসঙ্গমের সংবাদ পায় ওই ধর্মগ্রন্থ পড়ে''[৯]। আসলে 'আত্ম'-এর জিজ্ঞাসা, সংকট, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উপলব্ধি সবকিছুতেই তাঁরা তুলে ধরেছেন কোনো রাখঢাক না রেখে, প্রথম বুলেটিনে মলয় রায়চৌধুরী একেই বলেছিলেন 'merciless exposure of the self'।

আলোচনায় প্রবেশ করা যাক, 'হাংরি আন্দোলনের জনক' মলয় রায়চৌধুরীর লেখার সূত্র ধরে, হাংরি আন্দোলনে যাঁর ভূমিকাকে তুলনা করা হয়ে থাকে সিম্বলিসমে স্টিফেন মালার্মে, ইমেজিসমে এজরা পাউণ্ড, পরাবাস্তববাদে আঁদ্রে ব্রেতঁ এবং বিট আন্দোলনে অ্যালেন গিন্সবার্গের ভূমিকার সঙ্গে।[১০] তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-তে; ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয় 'জখম'। আর এই দুয়ের মাঝেই তিনি লিখেছিলেন সেই কিংবদন্তি-প্রায় কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'; যে কবিতাটি লেখার অপরাধে 'অশ্লীলতা'র দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল একসময়, কারাবাস করতে হয়েছিল তাঁকে। বড়ো বেশি শরীরধর্মী, যৌনতার আঁশটে ভাষায় লেখা এই কবিতা পড়ে আপাত-শ্লীল সমাজ অস্বস্তি বোধ করেছিল সেদিন; অথচ কবিতার ভিতরে যে চরম যন্ত্রণার প্রকাশ তা বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি তাঁরা কেউ। কবিতাটিতে কবির অপরিসীম যন্ত্রণা খুব স্পষ্ট, খানিকটা উদ্ধৃত করা হলো,

ওঃ মরে যাবো মরে যাবো
আমার চামড়ার লহমা জ্বলে যাচ্ছে অকাট্য তুরুপে
আমি কি কর্বো কোথায় যাবো ও কিছুই ভাল্লাগছে না
সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে চলে যাবো শুভা
....
প্রতিটি শিরা অশ্রুস্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়াভিগর্ভে
শাশ্বত অসুস্থতায় পচে যাচ্ছে মগজের সংক্রামক স্ফুলিঙ্গ
মা, তুমি আমায় কঙ্কালরূপে ভূমিষ্ঠ করলে না কেন?
তাহলে আমি দুকোটি আলোকবর্ষ ঈশ্বরের পোঁদে চুমু খেতাম
কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না আমার কিছু ভালো লাগছে না।[১১]

আপাত অশ্লীল এই ভাষ্যকে মন্থন করে সচেতন পাঠক পেয়ে যেতে পারেন অমৃত; আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত এক অস্থির আত্মার ক্রন্দনধ্বনি ও ছটফটানি। কবি অস্থিরভাবে লিখে গিয়েছেন, ''আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই / মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিল না / .... আমার বাবা মা অন্য হলেও কি আমি এরকম হতুম? / সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শুক্র থেকে মলয় ওর্ফে আমি হতে পার্তুম?[১২] এই পৃথিবীতে নিজের কোনো প্রয়োজন আদৌ ছিল কিনা—এই জিজ্ঞাসা থেকে এক অস্থির আত্মা এই জিজ্ঞাসায় গিয়ে উপনীত হয় যে, তাঁর এই অস্তিত্বের সম্ভাবনাই

বা কতটুকু ছিল; ভিন্ন কোনো শুক্র থেকেও সে'ই হতো কিনা। হাংরিরা বুঝে ফেলেছিলেন যে মানুষের জন্ম আসলে প্রোবাবিলিটি থিয়োরির অনন্ত পারমুটেশন-কম্বিনেশনের হিসাবের মতো। গতানুগতিক কবিতা পাঠে অভ্যস্ত আমাদের মন ১৯৬৪-তে প্রকাশিত এই কবিতাটির প্রাথমিক পাঠে অস্বস্তিতে পড়ে ঠিকই; কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে এবং একটু সচেতন হলেই বোঝা যায় যে, কবিতাটি অন্য এক ধরনের মর্মপীড়ায় আক্রান্ত করে আমাদেরকে। 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে উত্তম দাসও এই কবিতাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, ''প্রথম পাঠেই মনে হবে আমাদের সংস্কারের বাইরে এ কবিতা। কিন্তু গেঁথে যাবে একটা আর্তচিৎকার-অসহায়।''[১৩] আসলে এই কবিদের কাছে কবিতা হল তাঁদের অস্তিত্বের সম্প্রসারণ; এবং এই ব্যাপারে তাঁরা সচেতনভাবেই আগাগোড়া 'merciless'। শ্রীমন্তী সেন 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে 'চরমপন্থী-শিল্পী'[১৪] শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সেই সব শিল্পীদের যারা তাঁদের শিল্পকর্মের প্রতি চূড়ান্তভাবে সমর্পিত। আসলে হাংরিদের কাছে ভাষা হল জীবন-অভিজ্ঞতার সৎ প্রকাশ। 'সৎ' অর্থাৎ যা যেমন তাকে ঠিক তেমনভাবেই ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা যাবতীয় অসৎ-চৈতন্যকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, ভেঙে ফেলেছেন সমস্ত বাধার দেয়াল। বাস্তবকে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন খোলা ও খালি চোখে; কোনো পর্দার মধ্য দিয়ে নয়। আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী ১৯৬১-তে ইংরেজিতে যে প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে ভাষা ব্যবহার নিয়ে যে দু'চারটি কথা ছিল, তা নিম্নলিখিত[১৫]—

1. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
2. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
3. To break loose the traditional association of words and coin unconventional and here-to-force unaccepted combination of words.
3. To transmit dynamically the massage of the restless existence and the sense of disgust in a razor sharp language.

মলয় রায়চৌধুরী কথিত সূত্রগুলির মধ্যে কবিতায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ordinary conversation' অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তথাকথিত সাহিত্যিক ভাষাপদ্ধতি তাঁরা কেউই অনুসরণ করেননি। তাঁরা স্খলিত ও গলিত এই সভ্যতার রূপ ও গন্ধকে যতই তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁদের ভাষা ততই খড়্গের মতো ধারালো হয়ে উঠেছে; মলয় রায়চৌধুরী যাকে বলছেন 'razor sharp language'। কোনো রকমের শব্দসংস্কার মানেননি হাংরি লেখকরা। তথাকথিত 'অশ্লীল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বারবার যা আমাদের ভিক্টোরিয়ান রুচিবোধকে আঘাত করে। হাংরি কবিতাকে তাই শালীনতার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। হাংরি কবিতা মাত্রই পাঠকের চেতনাকে আঘাত করে সর্বদা; এই কবিতা ঠিক সুখপাঠ্য নয়—

৬. ভালোবাসা এঁকে বেঁকে মিশে যাচ্ছে অণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ডে[১৬] ('স্বপ্ন ও মহাশূন্য' - জীবতোষ দাস)
৭. আর এইসব যুবকদের স্বাস্থ্যল পাছা দেখে জাগে আপশোস
ইস আমি কেন হলুম না সমকামী![১৭] (কালো দিব্যতা - ফালগুনী রায়)

উক্ত উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, হাংরি লেখকরা প্রাতিষ্ঠানিকতা, গতানুগতিকতার ধ্বজা ভেঙে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম ছুঁৎমার্গিতা অস্বীকার করে বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তাঁরা তথাকথিত মধ্যবিত্ত রুচিবোধ বা নীতিবোধের সঙ্গেও কোনরকম আপোস করেননি; তাঁদের লেখালেখিতে সেই প্রমাণের ছড়াছড়ি। যেমন, ধরা যাক সুবো আচার্য তাঁর 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ'তে বলছেন,

সেই পবিত্র অস্তিত্ব, সেই অসম্ভব শুদ্ধ, ঈশ্বরের মতো আমার আত্মা
তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ক্রমশ ভুল সভ্যতার

শায়া তুলে ফেলি[১৮]

কবি এখানে 'শায়া তুলে ফেলি' কথাটি বলেছেন মোটামুটিভাবে 'পর্দা তুলে ফেলা' অর্থে। তবুও পার্থক্য খানিকটা রয়েছে এবং তা স্পষ্ট করতেই কবি পর্দার পরিবর্তে 'শায়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'শায়া তুলে ফেলা' প্রসঙ্গটির সঙ্গে আপাত অশ্লীলতা নিঃসন্দেহে জড়িয়ে আছে, এবং কবি খুব নিপুণভাবে তা এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আমাদের 'ভুল সভ্যতা'র কদর্য, পঙ্কিল, অশ্লীল দিকগুলিকে উদ্‌ঘাটন করা অর্থেই কবি বলেছেন 'আমি ক্রমশ ভুল সভ্যতার শায়া তুলে ফেলি।' কবি আরও বলেছেন, ''রাত্রি ঝরে পড়ে, গাঁজার ধোঁয়ার মতো কুয়াশা / সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঝরে যাওয়া বেশ্যার দৃষ্টি আমার''[১৯]। কবি নিজেকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে। বেশ্যার যেমন নিজের কাজের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে না, ঠিক তেমনই কবির দৃষ্টি—'সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঝরে যাওয়া বেশ্যার দৃষ্টি আমার'।

আসলে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ধারণা মাথায় রেখে হাংরিরা কোনোদিনই লেখালেখি করেননি; 'ক্ষুধার্ত' প্রথম সংকলনের সম্পাদকীয়তেও বলা হয়েছিল সে কথা, ''আমাদের শ্লীলতা নাই অশ্লীলতাও নাই।''[২০] তাই তাঁদের লেখালেখি কতটা শ্লীল বা অশ্লীল, সেই বিচারও একভাবে নিরর্থক। শঙ্খ ঘোষের একটি বক্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

> অশ্লীল যারা মনে করে, তারা ঠিক কবিতার বা সাহিত্যের পাঠক নয়, তারা সামাজিক লোকজন। সত্যিকারের পাঠকের কাছে এই 'অশ্লীলতা' কথাটির কোনো মানে হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপাত-শ্লীলতার মধ্যে দিয়েও বহু লেখা ব্যর্থ হয়, আপাত-অশ্লীলতার মধ্য দিয়েও বহু লেখা উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্ন এই ব্যর্থতা আর উত্তীর্ণতার, শ্লীলতা-অশ্লীলতার নয়।[২১]

হাংরিদের লেখালেখি থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শঙ্খ ঘোষের এই বক্তব্যকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। সুভাষ কুণ্ডুর 'মশামাছি' শীর্ষক লেখা বা গল্প থেকে কথকের একটি বয়ান তুলে ধরা হল,

> আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারা দেখে ঘাবড়ে যাই। গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল দুটো থুবড়ে গেছে। কোমরের হাড় উঁচু হয়ে আছে। বুকের দু'ধারে রিবগুলো গোনা যায়। লিঙ্গটা চুপসে ঝুলছে। দেখেই খুব বিপন্ন-বোধ করি। আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে দেয় যৌনাঙ্গ। মনে হয় স্ত্রী সহবাসের যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এরকম আমার প্রায়ই মনে হয়। মনে হলেই উঠে এসে আরশির সামনে দাঁড়াই।[২২]

নিবিড় পাঠে বোঝা যায় যে, উদ্ধৃত অংশটিতে বার্ধক্যের ছাপে কথকের উদ্বিগ্নতা, বিপন্নতাবোধ কতটা তীব্রভাবে ধরা পড়েছে। বার্ধক্যের ছাপকে মেনে নিতে পারছেন না কথক, এবং মেনে নিতে না পারার যে যন্ত্রণা তা 'বিপন্ন', 'কাতর', 'হারিয়ে ফেলেছি' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগে খুব স্পষ্ট। অশ্লীলতার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই এখানে। মানুষের শরীর তো আর যৌনাঙ্গ-বর্জিত নয়, তাই শরীরের কথা এলে অনিবার্যভাবে আসে যৌনাঙ্গের কথা; আসা উচিত। নইলে তা খণ্ডিত থেকে যায়। আয়নায় যখন কথক নিজের চেহারা দেখছেন, তখন গলার হাড় বেরিয়ে যাওয়া, গাল দুটো থুবড়ে যাওয়া, কোমরের হাড় উঁচু হয়ে যাওয়া, বুকের দু'ধারের রিবগুলো বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদির মতোই খুব স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই লক্ষ করেছেন যৌনাঙ্গেরও পরিবর্তন। আর 'আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে দেয় যৌনাঙ্গ'[২৩]—কথকের এই স্বীকারোক্তিতে অশ্লীলতা বা বিকার খুঁজে বার করাটাই সম্ভবত একধরণের অশ্লীলতা বা বিকার। শারীরবিদ্যা অনুসারে বলা যায়, যৌনতা আমাদের জীবনের ভরকেন্দ্র। এটা বিশৃঙ্খল হলে আমাদের জীবন ভারসাম্য হারায়। যৌনতাকে এড়িয়ে যাওয়া এক ধরণের জীবন-বিমুখতা বা জীবন-বিরুদ্ধতাও বলা যেতে পারে। হাংরিরা জানেন শরীর কখনোই যৌনাঙ্গকে বাদ দিয়ে নয়। যৌনাঙ্গ তাঁদের কাছে হাত-পা-চোখ-মুখ-মাথা-পেটের মতোই একটি অঙ্গ। তাই হাংরি কবিতায় আমরা দেখতে পাই এমন পঙ্‌ক্তি—

আমি একজন ক্রীতদাস
আমার হাত-পা-চোখ-মুখ-মাথ-পেট-যৌনাঙ্গ বা শরীর
জন্মাবধি শেকল ও তালা দিয়ে আঁটা[২৪] ('ক্রীতদাস' - জামালউদ্দিন)

এখানে কি কবি যৌনতাকে টেনে আনার জন্যই যৌনাঙ্গের উল্লেখ করেছেন? নাকি উদ্ধৃত অংশটির দ্বিতীয় লাইনেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে 'শরীরে'র ডিটেলিং করতে গিয়ে মানবশরীরের অন্য যে কোনো অঙ্গের মতোই অনিবার্যভাবে এসেছে যৌনাঙ্গের উল্লেখ। জীবন কখনই যৌনতাবর্জিত নয়, খুব সাবলীলভাবে হাংরিরা তাই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে কেবলি কি বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে যাবেন পর্ণোগ্রাফির বদলে। আপাতভাবে যৌনগন্ধী শব্দের প্রয়োগে এমন কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেতে পারে, যার সঙ্গে যৌনতার কোনো সম্পর্কই নেই। আবার ঠিক উল্টোটাও হতে পারে; একটিও মাত্র আপাত যৌনগন্ধী শব্দ ব্যবহার না করে লেখক তৈরি করে ফেলতে পারেন একটি যৌনগন্ধী ভাষ্য—

> বউ-এর দিকে মুখ করে মুচকি হেসে মেয়েকে বলি—'তোর মা আসার পরই আমার চেহারা এই রকম পটকে গেছে।' বউ ভ্রূ কুঁচকে হাসি হাসি মুখ করে বলে—'আমার চেহারাও ছোটোবেলায় খুব ভালো ছিল। .... এই রকম রোগা-প্যাটকা ছিলাম নাকি?' পরে কানের কাছে মুখ এনে বলে—'তুমিই তো করেছো।'[২৫]

তথাকথিত অশ্লীল শব্দ বলে দেগে দেওয়া হয় যে শব্দগুলিকে, তেমন একটিও শব্দ নেই; অথচ যে বক্তব্যটি বা ভাবটি প্রকাশ পেলো তা খুব একটা শ্লীল নয়। আবার অন্যদিকে 'আনন্দে' কবিতায় নির্মল হালদার যখন বলেন, ''মাঠ অর্থাৎ মাটির সঙ্গে লাঙ্গলের সংযোগকে, কে না বলবেন / যৌনানন্দ?''[২৬] তখন সেই কবিতায় পাঠক যৌনতাকে বুঝবেন নাকি ফার্টিলিটি কাল্টকে বুঝবেন, তা একান্তভাবে পাঠকেরই রুচির ওপর নির্ভর করে। 'The Naked Lunch' রচয়িতা উইলিয়াম বারোজের একটি সাক্ষাৎকার ক্ষুধার্ত সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছেন—

> অন্যান্য মানবশক্তির প্রকাশগুলির মতোই যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নোংরা করে অবমূল্যায়ন ঘটান হয়েছে, বা একেবারে অমানবিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্তই ছুৎমার্গীয় ব্যাপার। কবে যে আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে যৌনতাকে বুঝতে পারব, কবে আমরা বিষয়টাকে তদন্ত করতে পারব। এ সম্পর্কে যেমন ভাবাও হয় না, লেখাও হয় না। .... যৌন বিষয়ে একাধারে রয়েছে ছুৎমার্গীরা, অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয়। আসলে আমরা যৌন বিষয়ে কিছুই জানি না।[২৭]

সত্য গুহ হাংরিদের লেখায় তথাকথিত অশ্লীলতাকে বুঝেছেন ''ভান ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমাহীন আক্রমণ''[২৮] হিসেবে। যুগান্তর পত্রিকাও হাংরিদের লেখালেখিকে অশ্লীল বলতে নারাজ ছিল, যদিও সে'কথাটি স্পষ্টভাবে না বলে খানিকটা ঘুরিয়ে বলা হয়েছিল এভাবে—যে দেশে বাৎসায়ন ও কল্যাণমল্লের গ্রন্থ শাস্ত্র বলে কথিত, গীতগোবিন্দ ধর্মায়তনের ধুমধূনায় সম্মানিত, উড়িষ্যা খাজুরাহের শিল্প যে দেশে নিঃসঙ্কোচে রসশৈলীরূপে বিবেচিত, সে দেশে হাংরিরা নতুন কথা এমনকি বলেছে।[২৯]

তবুও 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির জন্য অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়; ''কলকাতার পুলিশ পাটনায় গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ইন্সপেক্টররা রিকশায় বসলেন এবং মলয়কে হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে চোর ডাকাতের মতন রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে বহু লেখাপত্র নষ্ট করে দেওয়া হল। ফাইল, বইপত্র, টাইপরাইটার ইত্যাদি বগলদাবা করে কলকাতায় নিয়ে গেল লালবাজার পুলিশ, যা আর পরে ফিরে পাননি।''[৩০] এই সময়ে বিপদ বুঝে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে মুচলেকা দিয়ে অনেকেই কেটে পড়েন, যে কারণে মলয় রায়চৌধুরী বলেন ১৯৬৫-তে এই আন্দোলন ফুরিয়ে যায়। অবশ্য কিছুদিন পরেই তাঁর সেই বন্ধুরা আন্দোলনের স্রষ্টার দাবিদাওয়া নিয়ে আবার আসরে নামেন,

'হাংরি' শব্দটিকে বর্জন করে 'ক্ষুধার্ত' নাম নিয়ে। ইতোমধ্যে মলয় রায়চৌধুরী যতটা জখম হওয়ার তা হয়েছেন; যাঁদের তিনি বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাংরি আন্দোলন মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। আদালতে দিনের পর দিন হাজিরা দিয়েছেন কবি মলয় রায়চৌধুরী। হাস্যকর হলেও সত্যি, এদেশের আইন বিচার করেছে কবির সেই কবিতাকে, যে কবিতাটি পরবর্তীকালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড 'স্টার্ক ইলেকট্রিক জেসাস' নামে, যেটি প্রকাশ পায় ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে।[৩১] তাই ১৯৬৫-তে যখন তাঁর 'জখম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন তাতে শোনা গেলো এক অনন্ত ক্ষুব্ধ আহত অস্থির কণ্ঠের স্বর। আহত এক কবি তাঁর ক্ষতচিহ্নগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জখম ভর্তি কবি হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়েছে এই দীর্ঘ কবিতাটি; এতটাই দীর্ঘ যে একটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছে। 'জখম' একটি কাব্যগ্রন্থ, একটি কবিতা, একটি মাত্র বোধের সম্প্রসারণ—

চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
তাঁর নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
দুঃখ কষ্টের শুনানি মুলতুবি রেখে
আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা কোরে নিচ্ছি
হাতের রেখার ওপর দিয়ে গ্রামোফোনের পিন চালিয়ে জেনে নিচ্ছি
আমার ভবিষ্যৎ[৩২]

'শুনানি', 'মুলতুবি', 'সন্দেহ', 'জেরা'—এই শব্দগুলি উঠে এসেছে কবির সেই দিনগুলির যাপন অভিজ্ঞতা থেকে। নিজের অন্তঃস্থল খুঁড়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন কবি। পৃথা রায়চৌধুরী 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> এই কবি তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর 'কবিতা পায়', ঠিক মানুষের বাকি সব পাওয়ার মতোই কবিতাও পায়। কবিতার সাথে কতটা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হলে, একাত্মতা থাকলে এবং কবিতার প্রতি একনিষ্ঠ থাকলে, কেউ এই কথা বলতে পারেন, তা সাধারণের পক্ষে বোঝা হয়তো দুষ্কর।[৩৩]

রাজনৈতিক বা তৎকালীন সাম্প্রদায়িক যত অসহিষ্ণুতা এবং অস্থিরতা ফুটে উঠেছে এই জখম ভর্তি কবিতায়। হাজিরা দিতে দিতেই তিনি দেখে ফেলেছেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চত্বরে কীভাবে আইনের মারপ্যাঁচের খেলা অভিনীত হয়। দেখেছেন আদালত চত্বরেই ভাড়া পাওয়া যায় সাক্ষী। কবিতাটি জুড়ে দেখা যায় কবি তাঁর সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পরিচালক, নিজের আর্থিক ও রাজনৈতিক যাপনের পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসা জীবনের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সরাসরি রাষ্ট্রকে, প্রতিষ্ঠানকে অবিরাম আক্রমণ করে গিয়েছেন কবি। তাঁর 'রাষ্ট্রের বহি-খাতা' কবিতায় এক মোক্ষম প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমরা। আমাদের নাগরিকত্ব, আমাদের স্বদেশের শেকড় কি কেবল সরকারের ঠাপ্পা মারা কয়েক টুকরো কাগজের মুখাপেক্ষী? তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে উঠে আসে আমাদের তুচ্ছতা, আপাতভাবে যা শুধু কবির দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির লঘু বর্ণনা, তা আসলে গভীরে ঢুকে নাড়া দেয় আমাদের; বুঝিয়ে দেয়, এইটুকুই আমাদের মূল্য। আবার 'আলো' কবিতায় তৎকালীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রূপকে তুলে ধরেছেন কবি—

আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া স্যাঁতসেঁতে ধুলোপড়া মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধায়
তক্ষুনি নিভে গেলে মুখে বুটজুতো পড়ে দুতিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই[৩৪] ('আলো', মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর)

প্রতিবাদী হলেই, প্রথা ভাঙার চেষ্টা করলেই কী কী ঘটে, তা ধরে রেখেছে এই কবিতার প্রতিটি শব্দ। প্রতিবাদী

কবিকণ্ঠে কবিতার শেষে উচ্চারিত হয়—

একসঙ্গে সব আলো আরেকবার নিভে গেলে
পরবর্তী আক্রমণ সহ্য করার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিই[৩৫]

প্রতিবাদী হলে তার শাস্তি কতটা অমানবিক হতে পারে, তাঁর একটি চিত্র আমরা পাই ফালগুনী রায়ের 'কবিতা বুলেট' কবিতাতেও—

আর কত সত্যিকারের সতী মেয়ে বিপ্লবের কারণে
যৌনাঙ্গে বহন করে পুলিশের চুরুটের ছ্যাঁকা[৩৬] (কবিতা বুলেট — ফালগুনী রায়)

সমস্ত অবিচারের জবাব যেন কবি দিতে চেয়েছেন 'কবিতা বুলেট'-এ। তাঁরা দেখেছেন সেই ভণ্ড মেকি সমাজকে, যে সমাজ কেরিয়ারিস্ট হতে পারাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে, যে সমাজে যেখানে ভেড়া চরে বেড়ায় সেখানেই বসে সংস্কৃতির প্যাণ্ডেল; যে সমাজে অধিকাংশ শিল্প 'ক্ষতস্থানের পুঁজ' এবং 'রক্ত চুঁইয়ে পড়ার মতো শিল্পের উল্লাস'[৩৭]; যে সমাজ ' মেয়েদের নষ্ট করে এবং নষ্টা বলে।'[৩৮] তাঁরা দেখেছেন সেই সমাজের এমন সব মানুষকে, 'যাদের মুখাবয়ব ঘৃণ্য, যাদের ভয়ংকর চোখগুলি কপালের নীচে গভীর কোটরে ঢোকানো। তারা পাথরের চেয়েও রূঢ়, ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, হাঙরের চেয়ে নিষ্ঠুর, যৌবনের চেয়েও উদ্ধত—ঘৃণ্য অপরাধীর চেয়েও নির্বোধ ও অনুভূতিহীন, চরম ভণ্ডের চেয়েও শয়তান, গ্রাম্য ভাঁড়ের চেয়েও উদ্ভট, পুরুত ঠাকুরের চেয়েও চরিত্রবান, চরম অন্তর্মুখী মানুষের চেয়েও এরা আত্মনিমগ্ন, স্বর্গের বা মর্ত্যের শীতলতম প্রাণীর চেয়েও শীতল।'[৩৯] মধ্যবিত্ত ইডিয়োলজিকে চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কবি ফালগুনি রায় তাঁর 'আমার বাইবেল আমার রাইফেল' কবিতায়—''গেঞ্জি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খেতে খেতে / আমরা শুনে যাবো নির্বিকার / রবীনঠাকুরের গান''[৪০]। হাংরিরা নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন তৎকালীন হীন রাজনীতিকে, ঘুণ ধরা সমাজের এঁদোকানা সমস্ত গলিগুলিকে। অরুণেশ ঘোষের 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ' কবিতায় দেখি একতলায় সোনার দোকানে, দোতলায় ব্যাঙ্ক আর তার ওপরে তিনতলায় পার্টি অফিস; অর্থাৎ রাজনীতির ভিত রচনা করেছে পুঁজি। যে রাজনীতিতে দূর-দূরান্তর থেকে দিনমজুর, কৃষকদেরকে প্রতারণা করে নিয়ে আসা হয় কপট ও শৌখিন মিছিলের শোভা বর্ধনের জন্য। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষকে মরে যেতে দেখেছেন তাঁরা, এমনকি তারপরেও সেই মৃতব্যক্তির নামে ভোট পড়তেও দেখেছেন—''ভোট দিতে গিয়ে একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে আমি মরে যেতে দেখেছিলুম / ভোটের লাইনে কিন্তু তার নামেও প্রক্সি পড়েছিল''[৪১]; অথচ ''আমরা ভোটের জন্যে রাজনীতির বদলে চেয়েছিলুম / রাজনীতির জন্যে ভোট''[৪২]। এহেন নোংরা রাজনীতিতে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়, কিন্তু যোগ্য চাকরীপ্রার্থী চাকরী পায় না। 'ল্যাঙটের তলায় লিঙ্গ গুটিয়ে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো?'[৪৩] হাংরিদের এই জিজ্ঞাসা আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ঘুণ ধরা সিস্টেমের প্রতি, যে সিস্টেম এই ধরণের প্রশ্নের মুখে বিপন্ন বোধ করে; আর তাই অশ্লীলতার অভিযোগ এনে মুখবন্ধ করে দিতে চায় এইসব প্রশ্নকারীদের। এই গণিকা সভ্যতায় দেখা দেয় ভ্রূণহত্যা, নেক্রোফিলিক মানসিকতার মতো অসুস্থতা, বিকার। এই দেশ-কালের পটে দাঁড়িয়ে থাকা হাংরিদের লেখায় অনিবার্যভাবে থেকে যায় নৈরাজ্যের লালন—

১. আমার গলিত শব পড়ে থাকে গোলাপকাঁটার ভিতর
শবের আশেপাশে ঘাস আর নৈরাজ্য, উড়ে বেড়ায়
মৌলিক প্রজাপতি; যার ডানা নীল, লাল শুঁড়
বুক ভরা বিষ আর বিষ আর বিষ[৪৪]

২. আমার সামনে থাকে অত্যাশ্চর্য কুয়াশা, থাকে দড়ি, আর
কালো পৃথিবী[৪৫]

৩. এই অকপট শ্মশান আমাদের উপযুক্তি ভূমি[৪৬]
৪. আমার আত্মার মধ্যে বিষকবিতার অভ্যুত্থান অহরহ
মানুষের উজ্জ্বল পায়েচলা পথ ছেড়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি
দূরে[৪৭]
৫. আমি প্রহরীর চোখে চোখ রেখে নিজের থুতু গিলে ফিরে আসি
উদ্বাহু বন্ধনের রজ্জুতে মোম ঘষে নেবার মতো জরুরি
কাজ পড়ে আছে, স্বাধীনতাই ভক্ষণযোগ্য মনে হয়![৪৮]

হাংরিরা দেখেন 'পানীর জলের প্রস্রাবে রূপান্তর', 'গোলাপের গায়ে বোগলের গন্ধ', 'নখের ভিতর লুকোনো ময়লা'।[৪৯] শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, ''হাংরিদের ইস্তাহার যতটা লক্ষ করেছি আর তাদের কবিতা বা গদ্যের সঙ্গেও যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে মনে হয় যে তাদের চেতনায় নৈরাদ্যবাদের একটা লালন অবশ্যই আছে।''[৫০] নৈরাজ্যের রাজ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা বলেন—

আমি কোনো উত্তরণ বুঝি না আর
কোনো অধঃপতন বুঝি না,
আজ সন্ধে থেকে মদ খেয়েও কোনো নেশা হয়নি—
আমার যৌনতা আমি খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে দেবো,[৫১]

(ঈশ্বর নেমে আসুক—সেলিম মুস্তাফা)

যাবতীয় বন্দীত্ব থেকেই মুক্তি পেতে চেয়েছেন হাংরিরা। তাঁদের কাছে যৌনতাও এক ধরণের বদ্ধতা নিয়ে আসে, তাই তাঁরা বলেন—''হায়, ক্ষুধা ও কামের চাপে আমার স্বাধীনতাও ফেঁসে যাচ্ছে।''[৫২] আর যা'ই হোক, হাংরি কবিরা যৌনতা-পূজারী নন কোনোভাবেই। সব মিলিয়ে মানবজন্ম তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে 'রহস্যময়' ও 'অস্বস্তিকর'—''কী রহস্যময় অস্বস্তিকর মানব জন্ম দেয়া / হয়েছে আমাকে''[৫৩]। শৈলেশ্বর ঘোষ বলেছেন,

> আমার কাছে সারা পৃথিবীময় সমস্ত সৃষ্টিকাজ একই সুরে বাঁধা, আত্মার বন্দিত্ব ও তার মুক্তির প্রচেষ্টা, তাঁর ক্রন্দন, হতাশার গর্জন ও অভিশাপ থেকে আনন্দে যাবার, এটাই একমাত্র আধুনিকতা চিরকালের— এছাড়া মানুষের অন্য কোনো ইতিহাস নাই![৫৪]

আর সেই বন্দীত্বকে ভেঙেচুরে 'সমস্ত নীতির মুখে লাথি মেরে'[৫৫] বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন হাংরিরা। হাংরিরা আগাগোড়া খুঁজে গিয়েছেন আমাদের ভেতরের 'আমি'কে। তাঁরা জানতেন—''জামাকাপড়ের অনেক নীচে / মানুষের চোখের বাইরে / আমি এক স্বতন্ত্র মানুষ।''[৫৬] তাঁরা তাই শরীরের নয়, নিঃসন্দেহেই মন ও মননের কারবারি—

আত্মার ক্ষয় নেই ভয় নেই লয় নেই
আত্মা অবলোকনে নেই রয়েছে মননে
যেমন সেতারের তারে সুর নেই কোনো
সুর আছে সেতারির মনে[৫৭] ('তিনটি কবিতা' - ফালগুনী রায়)

'জখম' কবিতায় মলয় রায়চৌধুরী বলেছিলেন, ''অসীম বলতে আমি বুঝছি আমার নিজেরই গায়ের চামড়া।''[৫৮] বৈদ্যনাথ মিশ্র 'মলয় রায়চৌধুরীর জখম ও অন্যান্য রক্তক্ষরণ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''এই লাইনটি পাঠক গভীরভাবে অনুধাবন করলে টের পাবেন আকাশের দিকে হাত তুলে 'অসীমকে' অনুধাবন করা যায় না। চেতনার বসতবাটি কবির অস্তিত্বে। তার শুরু ও শেষ উভয়েই তাঁরই বোধে অর্থাৎ দূরে কোথাও নেই, বরং তা নিকটতম, অনুভাব্য।''[৫৯] কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিসরেও হাংরিরা প্রায়ই নৈরাজ্যবাদী। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা বুঝেছেন, ''আসলে ভালোবাসা একটা খিস্তির চেয়ে বেশি নয়''[৬০]। প্রেম ভালোবাসা

তাঁদের কাছে 'ছেনালিপনা'র নামান্তর হয়ে ওঠে কখনও কখনও—''যতসব আবাল অপোগণ্ডের হৈ-চৈ, কোলাহল / প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদির ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। / বস্তুতই এইসব ছেনালিপনা আমার একদম বরদাস্ত হয় না।''[৬১] তাঁরা দেখেছেন কতো সহজে ভালোবাসা দিতে গিয়ে কতো সহজে বিষাক্ত হয়ে যায় ভালোবাসা। জগদীশ গুপ্তের মতো এঁরা সবাই সুস্থ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন 'পরস্পর স্বার্থরক্ষার অপর নাম প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা।'[৬২] তথাকথিত প্রেমের কবিতা তাঁরা কখনই লেখেননি, তাঁদের কবিতায় নেই সেই তুলতুলে ভাব। বরাবর প্রথাভাঙার নিদর্শন রয়েছে তাঁদের প্রায় প্রতিটি কবিতায়। অথচ প্রেমের কবিতা তাঁরাও লিখেছেন, তাঁদের মতো করে, নিজের উপলব্ধি থেকে। 'বুড়ি' কবিতায় মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন—

এও আমাকে বলে এবার ঘুমোও
আর রাত জাগা স্বাস্থ্যের পক্ষে
খারাপ, এই বুড়ি যে আমার বউ
বিছানায় শুয়ে বলে, কাউকে নয়
কাউকে দিও না খবর, কারুক্কে নয়—
এ কথা আমারই, কাউকে নয়
কারুক্কে বোলো না মরে গেছি।[৬৩]

প্রেমের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিতার ছত্রে ছত্রে। বিষাদও উপভোগ্য হয়ে ওঠে এখানে। এক পরম ভরসা, আঁকড়ে থাকাকে লালন করে রেখেছে কবিতার 'বুড়ি'। প্রিয়জনকে হারাবার যন্ত্রণাটাকেও ভাগ করে নিতে চান না কারোর সঙ্গে, এতটাই একান্ত ব্যক্তিগত, এতটাই একার সেই দাবি, হ্যাঁ 'এ-কথা আমারই', কেবলই আমারই। কবিতাটি পাঠে বোঝা যায় যে, এত ভালোবাসা, এত জীবন-প্রাচুর্যের মধ্যেও মৃত্যুচেতনা কতটা ঘিরে রাখে আমাদের অবচেতন। এ যেমন একদিকে প্রেমের কবিতা, সেই সঙ্গে এটি মৃত্যুচেতনারও কবিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মলয় রায়চৌধুরীর নিয়মিত পাঠক মাত্রেই জানেন এই 'বুড়ি' কবির স্ত্রী শলিলা রায়চৌধুরী। নিজেদের কথা বলেন তাঁরা, তাই আত্মপ্রক্ষেপও থাকে অনেকটাই; এমনকি তাঁদের বেশ কিছু লেখায় চরিত্রদের নামও অনেক সময় হয় তাঁদের নিজেদের নামেই।

জীবনকে হাংরিরা দেখতে চেয়েছেন খোলা চোখে; কোনো প্রতিষ্ঠানের ঠুলি পরা চোখে নয়। কোনো রকম ভান বা ভণ্ডামিকে পুঁজি করে বেঁচে আছে যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম হাংরিদেরকে রাবণ প্রতিপন্ন করে রাবণবধের আয়োজন করেছিল একদা। অথচ হাংরিদের রাবণও হাংরিদের মতোই কোনো ছলের আশ্রয় না নিয়ে উচ্চারণ করতে পেরেছিল সেই সত্যকথন—

আমাকে চিনতে পাচ্ছো না তুমি
আমি তো ভিক্ষা নিতে আসিনি''[৬৪] ('সীতা' - শৈলেশ্বর ঘোষ)

আসলে হাংরিদের লেখায় মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে 'প্রতিষ্ঠান'; তাঁরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন চাঁদ-ফুল-জ্যোৎস্নার কাব্যভাষাকে। তাই তাঁদের লেখাগুলিকে হজম করে নিতে তখনও অনেকেই পারেননি, আজও পারেন না। তাঁদের অবস্থান মেকিদের থেকে অনেক ওপরে। মেকিদের বিরুদ্ধে সবসময় রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। তাঁদের হাতের কলম বারবার তরোয়ালের মতো ঝলসে উঠেছে, ফালাফালা করে দিয়েছে যা কিছু বস্তাপচা। আপাত অশ্লীল, আপাত অগোছালো ভাষ্যের ভেতর দিয়ে আলগোছে নিংড়ে বের করে এনেছেন মানুষের ভেতরের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, নানান সংঘাত। পাঠক ক্রমাগত তড়িদাহত হতে থাকেন তাঁদের কবিতায় ছত্রে ছত্রে, শব্দে শব্দে।

তথ্যসূত্র

১. উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৩০২; মহাদিগন্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯।

২. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, হাংরি সাহিত্য আন্দোলন ঃ তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস; কলকাতা-২, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৪।

৩. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ২০-২১।

৪. সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা ঃ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩, পৃ. ৩।

৫. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ১৪।

৬. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৯।

৭. তদেব, পৃ. ৮৯।

৮. তদেব, পৃ. ৭৯।

৯. তদেব, পৃ. ২২১।

১০. শ্রীমন্তী সেনগুপ্ত, 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবিতীর্থ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ৩৮তম বর্ষ, বর্ষা ১৪২৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৫০।

১১. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪৩-৪৪।

১২. তদেব, পৃ. ৪৫।

১৩. তদেব, পৃ. ৪৬।

১৪. শ্রীমন্তী সেনগুপ্ত, 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৫২।

১৫. সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা ঃ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৩-৪।

১৬. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৬৯।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৯৮।

১৮. তদেব, পৃ. ৪৭।

১৯. তদেব, পৃ. ৪৮।

২০. তদেব, পৃ. ৪৫।

২১. তদেব, পৃ. ৪৮১।

২২. তদেব, পৃ. ৬৯।

২৩. তদেব, পৃ. ৬৯।

২৪. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫৭৬।

২৫. তদেব, পৃ. ১৬৯।

২৬. তদেব, পৃ. ৪৪২।

২৭. তদেব, পৃ. ৩২৮-৩২৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৪৯।

২৯. তদেব, পৃ. ১৪৮।

৩০. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১২৪।

৩১. তদেব, পৃ. ১২৫।
৩২. মলয় রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, কলকাতা-৭০, আবিষ্কার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫, পৃ. ১৯৩।
৩৩. পৃথা রায়চৌধুরী, 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৪৬-১৪৭।
৩৪. মলয় রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, পৃ. ১৭৪।
৩৫. তদেব, পৃ. ১৭৪।
৩৬. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫৫০।
৩৭. তদেব, পৃ. ৩৯৫।
৩৮. তদেব, পৃ. ৮৯।
৩৯. তদেব, পৃ. ৫৪৬।
৪০. তদেব, পৃ. ২২২.।
৪১. তদেব, পৃ. ২৮৪-২৮৫।
৪২. তদেব, পৃ. ৪০৫।
৪৩. তদেব, পৃ. ২৮৪-২৮৫।
৪৪. তদেব, পৃ. ৫৫৯।
৪৫. তদেব, পৃ. ৫৬০।
৪৬. তদেব, পৃ. ৫৬১।
৪৭. তদেব, পৃ. ৪৭।
৪৮. তদেব, পৃ. ৫৫৭।
৪৯. তদেব, পৃ. ৫৬৩।
৫০. তদেব, পৃ. ৪৮১।
৫১. তদেব, পৃ. ৫৩৩।
৫২. তদেব, পৃ. ৪৯।
৫৩. তদেব, পৃ. ৪৭।
৫৪. তদেব, পৃ. ২২০।
৫৫. তদেব, পৃ. ১১১।
৫৬. তদেব, পৃ. ৫২৩।
৫৭. তদেব, পৃ. ৫৫২।
৫৮. মলয় রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, কলকাতা-৭০, আবিষ্কার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫, পৃ. ২০৫।
৫৯. বৈদ্যনাথ মিশ্র, 'মলয় রায়চৌধুরীর জখম ও অন্যান্য রক্তক্ষরণ' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৩৪।
৬০. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫০।
৬১. তদেব, পৃ. ১১১।
৬২. তদেব, পৃ. ৪০১।
৬৩. উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৪২।
৬৪. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫৭৯-৫৮০।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অনিল আচার্য সম্পাদিত, সত্তর দশক, কলকাতা-৯, অনুষ্টুপ, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪।
২. অপূর্ব কুমার রায়, শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৬।
৩. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬।
৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ার ভাঁটায় ষাট সত্তর, কলকাতা ঃ পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
৫. অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২।
৬. উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৩০২, মহাদিগন্ত, জানুয়ারি ২০০২।
৭. উদয়কুমার চক্রবর্তী, বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২।
৮. ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮, ইসক্রা, জুন ২০১৪।
৯. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, হাংরি সাহিত্য আন্দোলন ঃ তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, কলকাতা-২, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৫।
১০. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।
১১. মলয় রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, কলকাতা-৭০, আবিষ্কার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫।
১২. শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।
১৩. সত্য গুহ, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, কলকাতা-১২, অধুনা, ১৯৭০।
১৪. সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা ঃ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

1. Donald Freeman, Linguistics & Literary Style, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1970.
2. J.V. Cunningham, The Problem of Style, New York, Fawcett World Library, 1966.
3. Seymur Chatman, Literary Style, A Symposium, U.K., Oxford University Press, 1971.

শিউলি বসাক
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শবরচরিত : নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য

চঞ্চল মণ্ডল

নলিনী বেরার 'শবরচরিত' উপন্যাসে উঠে এসেছে অরণ্যঘেরা আদিম জনজাতির কথা। সুবর্ণরেখা নদীর চারিদিকের জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে লালিত বিভিন্ন নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচিত্র তাঁর উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন। নলিনী বেরার আগে বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচিত্র তাঁদের উপন্যাস ও গল্পে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য সার্থকভাবে প্রথম ফুটে উঠেছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তাঁর উপন্যাসে আমরা পেলাম জনপদ জীবনের নানা চিত্র। জনপদ জীবনের আলক্ষ্যকার রূপে, ইতিহাসের ক্রনিকার রূপে, সমাজের ভাঙ্গাগড়ার নিপুণ বিশ্লেষক রূপে তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন। ভারতের বিচিত্র ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি তথা আদি জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতিই তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্তঃস্থল। তাঁর লেখনি আমাদের পরিচিত কালের দুর্বার অর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন ফুটে উঠেছে। তাঁর সমাজবোধ, যুগ-পরিবর্তনের সচেতনতা, বাস্তব আনুগত্য ও শিল্প দায়িত্ব দেখা যায় তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'কবি', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা'', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি উপন্যাসে। তাই সমালোচক দীপক চন্দ্র তারাশংকর সম্পর্কে বলেছেন—

> "জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গভীর-গভীর রূপ তাঁর দৃঢ় কঠিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমুদ্ভাসিত। শুধু এই কারণেই কি তারাশঙ্করের রচনা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জনজীবনের মধ্যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করার প্রেরণা তাঁর রচনাতে পড়েছে ক্লাসিকধর্মী। গ্রামের মানুষ ও প্রকৃতি, গ্রামের সমাজ, ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিশ্বাসের মধ্যে ভারতীয় জীবনবোধ তথা বাংলার শাশ্বত জীবনধর্মের সন্ধান করেছেন।"[১]

তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন । তিনি তথাকথিত অন্ত্যজ ও অপাংক্তেয় সাঁওতাল, ডোম, হাড়ি, বাগদি, কাহার, চণ্ডাল, জেলে, মুচি ও মেথরদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতেন। এ প্রসঙ্গে বরিশালে এক সাহিত্য সংস্থার আমন্ত্রণে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির কাছে মন্তব্য করেছিলেন—

> "আমাদের দেশের উদয়াস্ত খেটে খাওয়া গরীবলোক, বাউরী, বাগদী, কাহার, সাঁওতাল, সামান্য জমিজমা সম্বল উঁচুজাত, ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গেলেও যারা বাইরের চটক ছাড়তে রাজী নয়, বৈরাগী, বাউণ্ডুলে, বেদে, সাপুড়ে এমনকি নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশেছি, বলবার চেষ্টা করেছি তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ- বেদনার কথা....।"[২]

তাঁর রচনায় দেখা যায় রাঢ় অঞ্চলের বেদে, ডোম, কিষাণ, বাগদি, কাহার, সাঁওতাল, মাঝি-মল্লা, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের তথাকথিত অপজাত ও উপেক্ষিত মানুষ। আদিম জনজাতির মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাঢ়ের আদিবাসী সমাজ—

> "তারাই উত্তরাধিকার বহন করেছে রাঢ়ের উপেক্ষিত 'ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন জনসমাজ'। এদের মধ্যে হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরিরাই প্রধান। অন্যান্য উপজাতির মধ্যে আছে রাজবংশী, জেলে, লেটভুলা, সদগোপ, কোরা, কাহার লোহার, ভুঁইমালী, মুচি, মেথর, চামার, যদুপতিয়া ও সাঁওতাল।"[৩]

এদের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তারাশঙ্করের জীবনবোধ প্রখর ও শানিত হয়। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে

মণ্ডল, ড. চঞ্চল : শবরচরিত ঃ নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 40-44, ISSN 2249-4332

এইসব অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ নিম্নবর্গের মানুষের বৃত্তি ও জীবিকা, সংস্কার-প্রথা, আচার-রীতি-নীতি, প্রবৃত্তি, পূজা-পার্বণ উৎসব, নৃত্যগীত ও জীবনচর্যার নানাদিক ফুটে উঠেছে।

তারাশঙ্করের পরে আদিম জনজাতির কথা উঠে এসেছে অদ্বৈত মল্লবর্মন, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি লেখকদের মধ্যে। তারপর পেলাম মহাশ্বেতা দেবীকে। তিনি বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় আদিবাসী জনজাতির মানুষের জীবনালেখ্য নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন যে সকল সাহিত্যিকেরা তার মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা দেবী। তিনি আদিবাসী মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন জীবন অতিবাহিত করে তাদের একজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আর তাদের জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেই উপলব্ধির বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর 'অরণ্যের অধিকার', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর', 'ব্যাধখণ্ড', 'টেরোড্যাকটিল', 'পূরণ সহায় ও পিরথা' প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাসে এবং দ্রোপদী, জন, অপারেশন ? বসাই টুডু' রুদ্দালী, ভাতুয়া, নিশাত মাঝারি ভুটান যাত্রা' এরকম অসংখ্য গল্পে। মহাশ্বেতার এই কর্ম প্রয়াসি পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধদেব গুহ, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা প্রমুখ সাহিত্যিকদের মধ্যে।

নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে অরণ্যঘেরা জন্মভূমির কথা। জন্মভূমির সঙ্গে তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন সুবর্ণরেখা নদী বিধৌত জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে লালিত বিভিন্ন জনজাতির জীবনকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন জনজাতির কথা উঠে এসেছে তাঁর 'শবরচরিত' (২০০৯) উপন্যাসে। তিনি শবর-লোধা-ভূমিজ-সাঁওতাল-মাহাতোদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি চিহ্নিত করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতায়। ফলে সেই চিত্র হয়ে উঠেছে অত্যন্ত নিখুঁত। 'শবরচরিত' উপন্যাসটি লেখার সময় দীর্ঘ দশবছর তিনি শবর-লোধাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে তার উল্লেখ পাই—

> "বিগত প্রায় দশটা বছর আমি রাইবু-গুরগুড়িয়া-গুড়কুঁদা-শারাবন-শস্তুরা-ফুলটুসি-শিশুবালা-সোমবারি-নিয়তি-সাবিত্রী-ঢালো-আদরী-ভাদরী-নুকু-ভুটকী গুরবারি-চাঁঘারি-হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়রি-লাইরকা-নীলুয়াদের সঙ্গে। ছিলাম ডুবকা-ডুংরিতে বনে-ঝাড়ে-বরকুদরী-বনকল্লা-বনকাঁকড়ো-আলু তুঙা-ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ-কষাফল আহরণে, গোই-গোধি-ঢ্যামনা-খঙ্গা-বঙ্গা শিকারে। ছিলাম নামাল খাটায়, দাঁতনে, কড়িয়া বামনদায়। লেখা শেষ করে এই মুহূর্তেই মনে হল আমি বুঝি স্বজনহারাই হলাম। বিষাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে মনে।"[৪]

শবরদের সঙ্গে সশরীরে কাটানোয় তাদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকার এই জনগোষ্ঠী 'অপরাধ প্রবণ' আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছিল। এই অপবাদ থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে হয়তো আজও সম্ভব হয়নি। ফল স্বরূপ এদের সামাজিক অবস্থা আজও প্রচণ্ড ভাবে বিপর্যস্ত। নলিনী বেরা তাঁর 'শবর রচিত' উপন্যাসে মূলত ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার মতো বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা জঙ্গলমহলের শবরদের কথা বলেছেন। এই বিস্তীর্ণ ভূমির সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠী হল শবর। তিনি এদের কখনো 'লোধা-শবর' বলে চিহ্নিত করেছেন, কখনো শুধু লোধা অথবা শুধু শবর বলেও চিহ্নিত করেছে। এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেছেন—

> "এ উপন্যাস তাদেরই নিয়ে লেখা যারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শবর' ঋগবেদে 'অসুর' অমরকোষে 'ম্লেচ্ছ" মৎস্য আর বায়ু পুরাণে 'ক্ষত্রিয়'। তা ছাড়াও 'লোধা', 'খেড়িয়া', আককুটি' ইত্যাদি কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতই নানা নামে চিহ্নিত ও পরিচিত।"[৫]

সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এদের অবস্থান নিম্নস্তরে। ব্রিটিশ শাসন কালে নিয়তি এদের জীবনকে যে অন্ধকারময় পথে ঠেলে দিয়েছিল সেই অন্ধকার পথ আজও তাদের কাছে অনন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়েও এরা আলোর দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। অরণ্যের সঙ্গে এদের নাড়ির যোগ থাকলেও অবাধে অরণ্যে বিচরণ করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। অরণ্য

রক্ষিবাহিনী এখনো এদের দেখলেই তাড়া করে অরণ্য সম্পদ চুরির দায়ে থানায় চালান করে দেয়।

লোধা-শবরদের জীবিকার দিকে তাকালেই এদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নারীরা বন জঙ্গল থেকে ফুল-ফল-মূল-শাকপাতা সংগ্রহ করে দৈনন্দিন আহার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তা বিক্রি করতে আশপাশের গ্রামে যায়। আর পুরুষেরা বন থেকে কাঠ, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিক্রি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের পশুর চামড়া বিক্রি করে। কিন্তু বনসংরক্ষণ আইন চালু হওয়ায় এদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো করুণ হয়। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটাতে এরা বিকল্প জীবিকা দিনমজুরের কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্তু 'অপরাধ প্রবণ' জাতির তকমা থাকায় তারা আশেপাশের গ্রামে কাজ পায় না। ঠিকাদারদের জালে বন্দি হয়ে দিনমজুরের কাজে তারা দূরদেশে পাড়ি দেয়। দিনরাত পরিশ্রম করেও তারা সেখানে যথার্থ মজুরি পায় না। তবে চুরির অপবাদ না থাকায় অল্প মজুরি সত্ত্বেও তাদের অভিযোগ থাকে না।

উপন্যাসে পরবর্তী সময়ে দেখা যায় আদিবাসীদের জন্য সরকার থেকে নানা ধরণের প্রকল্প আরম্ভ হয়। এই প্রকল্প গুলির মধ্য দিয়ে তাদের পশুপালন, বাঁশ চাষ, বাবুই ঘাস চাষাবাদের জন্য সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষুধা-দারিদ্রের তাড়নায় পীড়িত লোধা শবরেরা সরকারের প্রকল্পের সৎব্যবহার করতে পারে না। সে টাকা দিয়ে পশু, বাঁশ ও বাবুই ঘাসের দানা না কিনে সে টাকা খেয়ে খরচ করে ফেলে। আবার সরকারের তরফ থেকে লোধা-শবরদের প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য একটি করে টিনের ঘর দেওয়া হয়। উপন্যাসে রয়েছে টিনের সেই ঘরগুলির কথা—

> "টিনের ছাউনি ইঁটের দেওয়াল দেওয়া ঝুপড়ীর ভেতর থেকে লোকটা বেরুল। .... এটা তার ঘর। এরকম আরো দু-দশটা ঘর দোরখুলির লোধাপাড়ায় নাকাবিন্ধি-পেটবিন্ধি-পাতিনার শবরপল্লীতেও আছে। খুনোখুনি কাটাকুটির বছর মহামান্য সরকার বাহাদুরই বানিয়ে দিয়েছে।"[৬]

কিন্তু এই ঘরগুলিও তারা পেটের দায়ে রাখতে পারেনি। নলিনী বেরার 'শবরচরিত' উপন্যাসে লোধা-শবরদের সামগ্রিক জীবন স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

জীবনে যে পাঁজি-পঞ্জিকার তেমন একটা গুরুত্ব নেই তা নিয়ে একটি প্রবাদের প্রচলন রয়েছে—

> "যতই দেখ পাঁজি-পুঁথি আষাঢ় মাসের সাতদিনে হয় অম্বুবাচী।"[৭]

অম্বুবাচী হিন্দুধর্মের একটি বাৎসরিক উৎসব। লোকবিশ্বাস অনুসারে আষাঢ় মাসের সপ্তম দিন থেকে ধরিত্রী মাতার ঋতুস্রাব হয়। পাঁচদিন ধরে এই ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। আর এই বিশেষ দিনগুলি বর্ষা মুখরিত হয় বলে এদের ধারণা। লোকসমাজের লোকেরা এসময় কোনো ধরনের মাঙ্গলিক কার্যে হাত দেয় না। এর পাশাপাশি এই সময় হাল ধরা কিংবা মাটি খোঁড়াও নিষিদ্ধ। তাই এই বিশেষ দিনগুলিকে মনে রাখার তাগিদ থেকেই এদের মুখস্থ হয়ে আছে, আষাঢ় মাসের সাতদিনে অর্থাৎ সপ্তম দিনেই অম্বুবাচী হয়।

নানান সময়ে নানান কারণে অথবা কখনো অকারণে লোধা-শবরদের জেল যেতে হয়। জঙ্গল আইনের পর নির্ভয়ে জঙ্গলে চলাচল করার জন্যে ফরেস্ট গার্ড যেমন কখনো কখনো বনসম্পদ চুরির দায়ে তাদের ধরে থানায় চালান করে দেয়। তেমনি নানান সময় গৃহস্থের ঘরে চুরি ডাকাতি করার সন্দেহে প্রশাসন এদের হাজতে পোরে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এদের নামে কোনো রূপ কেস তৈরি না করে এদের এভাবেই আটকে রাখা হয়। এরা বিচারকের কাছে কোনো রূপ বিচার পায় না। বিনা বিচারেই এরা হাজতে পড়ে পড়ে জীবন অতিবাহিত করে। আইন সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় এবং কোনোরূপ জরিমানা দিতে সক্ষম না হওয়ায় এদের সেখান থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লোধা-শবর সমাজে হাজত সম্পর্কিত একটি প্রবাদ তৈরি হয়েছে—

> "যে যায় হাজতে তাকে খায় যমদূতে।"[৮]

অর্থাৎ, যে একবার হাজতে যাবে মৃত্যুর আগে তার কোনোভাবেই রেহাই সম্ভব নয়, আমৃত্যু তাকে থাকতে হবে জেলে। কখনো হয়তো দোষে আবার কখনো বা বিনা দোষেই।

জাতের বিচারে লোধাশবরেরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণের থেকে উঁচু বলে বিচার করে। জাত্যভিমানের দিক থেকে এরা

কিছু কম নয়। কিন্তু জঙ্গল আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর অরণ্য সম্পদ থেকে এরা যখন বঞ্চিত হয়, তখন এদের একটি মাত্র ঝুপড়ি তোলার মতো বাস ভিটাটুকু ছাড়া আর কিছু সম্বল থাকে না এবং মাথায় চোরের কলঙ্ক এসে পড়ায় এরা দিন-দিন অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পেটের ক্ষুধা তখন জাতের উপর যেতে পারে না। যতই জাত্যাভিমান থাকুক না কেন এরা বলতে বাধ্য হয় যে—পেটে যাদের ভাত নেই তাদের জাত নিয়েও কোনো মাথা ব্যথা নেই।

যে বনে বসবাস করলে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু যে বন্য পশু জীবজন্তু লোধাদের একমাত্র সমস্যা তা নয়। বন্য জীবজন্তুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা, দাবানল ইত্যাদি সমস্যাও রয়েছে। কিন্তু লোধাদের সমস্যা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। অরণ্যে বসবাসকালে লোধারা ফরেস্ট গার্ডের দ্বারা বারে বারে তাড়িত হয়। লোধাদের ভগ্নপ্রায় পাতার কুটিরগুলোকে বার বার নানান অজুহাতে হানা দেওয়া হয়। পুলিশ লোধা পুরুষদের ধরে হাজতে পুরে দেয়। এই ভয়ে যখন সমস্ত লোধা পুরুষেরা ঝুপড়ি ছেড়ে পালায় তখন লোধা নারীদের উপর শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার। বিশেষত নারীদের উপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যেই লোধাপাড়ায় পুলিশ রাতের বেলা হানা দেয়। বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পুলিশী হানা এই ত্রিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হাঁপিয়ে ওঠা লোধাদের সবসময়ই মনে হয়—

"বনের মধ্যে বাস, ভাবনা বারোমাস।"[৯]

লোধাশবরেরা বিশ্বাস করে তারামণ্ডলে এমন কিছু তারা আছে যেগুলি মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়। যাকে তারা 'ভুল্‌কাতারা' বলে। এই ভুল্‌কাতারা দেখলে ডান-দিককে মানুষ ভুল করে বাঁদিক ভাবে, আর বাঁদিককে ভাবে ডান দিক। চাঁদবদনী ও ভূটকিরা প্রতিদিনের মতো জঙ্গলে মাহুল কুঁড়াতে গিয়ে যেদিন মাহুল গাছের তলায় অন্য জাতির মেয়েদের দেখতে পায়না, এবং জঙ্গলের পরিবেশ প্রতিদিনের চেয়ে অন্যরকম ঠেকে সেদিন তাদের মনে হয় তারা আজ পোহাতারা না দেখে ভুল করে হয়তো ভুল্‌কাতারা দেখে বেরিয়েছে?

নিঃসন্তান স্ত্রীর মুখ দর্শনকে লোকসমাজে অশুভ বলে মনে করা হয়। ভাই ধারণায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করে যাত্রাকালে নিঃসন্তান নারীর মুখদর্শনে অমঙ্গল হতে পারে। এই উপন্যাসেও দেখা যায় রাইবু তার সহকারী গুড়গুড়িয়াকে ফরেস্টের গার্ড নরসিঙার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিল। কিন্তু এই কাজে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। শুধু তাই নয় নরসিঙা তাকে বাপ তুলেও গালিগালাজ করে। এভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর রাইবুর মনে হয়—"আজ সকালে ঘুম কার মুখ দেখে যে উঠেছিল সে! রাগ করে রাইবুও মনে মনে বলল, নির্ঘাত শিশুবালা! আঁটকুড়ি!"[১০] ফলে লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারের সাথে লোধা সমাজের সংস্কারের একটা সাজুয্য এখানে লক্ষ করা যায়।

উপন্যাসে চাষবাদের জন্যে জমিজমা না থাকায় শবরেরা আশা করে সরকারের কাছ থেকে জঙ্গলের একটি অংশ তসর চাষের জন্য লিজ পাবে। চাষীরা যেমন চাষের জন্য উপযুক্ত জলবায়ুর আশায় বুক বেঁধে থাকে; অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, জলবায়ুর ব্যাপারটা সম্পূর্ণই প্রকৃতির নিজস্ব ব্যাপার। তেমনি তসর চাষের জন্য জঙ্গল লিজ নিতে চাওয়া আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল শবরদের বুক বেঁধে বসে থাকাও একই কথা। শবরেরা ভালোভাবেই জানে সরকার বাহাদুর এদের উপর মেহেরবান না হলে জঙ্গল লিজে পাওয়া সম্ভব নয়, তবুও এদের আশা থেকে যায়, ধার-দেনা যা করেই হোক লিজ নেবেই।

জঙ্গলমহলের বাসিন্দা শবরেরা পঞ্জিকা দেখে দিন গণনা করে চলে না। শুধুমাত্র পাঁজি-পঞ্জিকা রাখার সামর্থ্য নেই বলে নয়, এদের কাছে পঞ্জিকা নেই কারণ এরা এটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। বরং এরা মনে করে দিন-কাল সমস্তই এদের নখদর্পণে। দিন-কাল-মাস-ঋতু-পূর্ণিমা-অমাবস্যা সমস্তই করে হাতের আঙুলের কড় গুনে। অথবা ছঁচমাটি দিয়ে লেপা দেওয়ালে রেখা কেটে এরা হিসাব করে। এছাড়া বনের ফুল-ফল, শাক-সব্জী, প্রকৃতির রূপের বাহার, জলবায়ু-আবহাওয়া ইত্যাদি দেখেও এরা মাসের হিসেব বের করে নেয়।

তথ্যসূত্র :—

১. দীপক চন্দ্র, ভারতাত্মা তারাশঙ্কর, কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পৃ. ৮৩১।
২. জরাসন্ধ, তারাশঙ্কর ও রাঢ়দেশ, তারাশঙ্করের স্মৃতি সংখ্যা, কালি ও কলম, ১৩৭৮ পৃ. ৫৮।
৩. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের জীবনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ১৭।
৪. নলিনী বেরা, শবরচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৯, উৎসর্গ।
৫. তদেব, প্রচ্ছদ।
৬. তদেব পৃ. ১১১।
৭. তদের পৃ. ৫৯।
৮. তদের পৃ. ১৪৮।
৯. তদেব পৃ. ৩০৩।
১০. তদেব পৃ. ৩৬০।

চঞ্চল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ

I'm Not a Bisexual; I'm a Gay as a Goose: Memory, Discourse and Paralogy in Dattani's Mango Soufflé

Manodip Chakraborty

Abstract : The unerring panoptical presence of a heterosexual gaze constitutes the central crux of India's first gay film. The spatiality of the enclosed land, coupled with the music of a heterosexual marriage just outside the periphery, served as the stimulus generator for the characters' inner traumas – their desperate struggle to give meaning to their existence; which is somewhat different from what the society prescribes. Confronting the dark discourses of cultural normativity, Dattani used the elements from his own play to create the semiotic sphere of articulation. Towards the end, the crucial discovery of the men-to-men copulating photograph by the heterosexual representatives, leaves the audiences not with cathartic effect but with tragic alienation. Baffled with the crude unfolding of events, one ought to contemplate on the meaning of human individuality. This paper thus proposes to analyse Dattani's use of triggering mechanisms adopted from his play, by which he wished to unearth the dystopia of subjective formulations, functioning right under the surface of a visible democratic utopia and his proposal of an alternate human subjectivity.

Keywords: Memory, Aphasia, Cognition, Equivalence, Discourse

Introduction : Written and directed by Mahesh Dattani, India's first Sahitya Akademi Award-winning dramatist, *Mango Soufflé* (2002) has transformed the semiotics of the Indian cinematic genre. A not so straight movie - it has naturally drawn negative criticisms for challenging the prescribed norms. Dattani's oeuvre mainly "draws attention by its contemporary relevance while representing the urban middle class in general" (Kumar and Prakash 110). Employing homogenization, post-independent India has evolved itself out of the mold of westernization – consciously eliminating its distinct voices. Through the spatial and temporal articulations, its inhabitants were made to feel alienated from each other. Dattani strikes at this artificial 'equivalent' conspiracy. By situating the narrative within an isolated sphere, it evokes the audience's cognition about the "identity, unpacking the collective as multiple bodies with distinct histories and oddities, inhabitants of separate territories, yet participants in civil society" (Oommen 347).

The central crux of the narrative arises out of the characters' self-imposed 'hysteric confrontations' –"that is to say, not only have no perceptible changes in the nervous system been found in this illness, but it is not to be expected that any refinement of anatomical techniques would reveal any such changes" (Freud 41). The absence of legitimized sexual

Chakraborty, Manodip : *I'm Not a Bisexual; I'm a Gay as a Goose* : Memory, Discourse and Paralogy in Dattani's Mango Soufflé
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 45-50, ISSN 2249-4332

discharge mechanism has left them prone to repression. The proneness to repression is not the only contributor to human memory, which is divided into two broad categories, the conscious and the unconscious apparatus. The conscious part is a construct of the cultural schemata and the unconscious part is a configuration of individual repression(s). What emerges out of this dystopic synthesis is not a 'single' subject, but a 'split' object. The rise of popular media, in this respect, encompasses the whole of *conscious cognition*. Kamlesh, Sharad, Deepali, Bunny Singh, Ranjit are all oscillating between*identification* of pre-given societal norms and the stimulus of their inner 'pleasures'. Their discharge apparatus could only function in the absence of societal restriction – in an isolated *mango garden*. This spatial geography with its huge distinct walls – marks a separation between the manifested societal products and the inner libidinal desire(s). Therefore any form of 'uncanny' revelation is possible in this isolated atmosphere. The discovery of the homo-erotic, man-to-man copulating photograph in this sense provided the semiotic stimulus – a key to unlock the repressed memories of 'identified' characters. Even *Bunny Singh*, the most identified character, who has in order to be 'accepted' as a cultural product,*consciously*repressed his homosexual apparatus, breaks out in a soliloquy : "I try to survive in both the worlds and it seems I don't neither… I was chosen for this part…I lie to myself first and I continue to lie to millions of people"(Dattani 01: 06: 10 – 01: 07: 39). In this sense, Human memory is never a static element – every time it encodes and decodes, it subjects itself to the spatial and temporal aspect of cultural context. Therefore "the point is that…memory is culturally determined ways of looking at human beings" (Wierzbicka 13). It is the ontology of *real*, without any tinge of *reality*.

Dattani adequately employed the technique of *flashbacks*, in order to unfold the synthetic mechanisms of repressive memories thatgo in the construction of an *individual*. By adjoining the *present* state conditioned by *past* elements, this device provided coherence to the verbal discourses. In multi-layered revelations, Kamlesh's abrupt invitation to all his closeted *mates* was conditioned by his 'angel in the house' sister's heterosexual marriage with Ed. This incident in turn was conditioned by Ed's(heterosexual) transformation from Prakash (homosexual); which in turn was sparked off by a disastrous one-sided homo-erotic relation with Kamlesh. The spiralling nature of present temporality was therefore totally engulfed by the past's spatiality. In this respect what differs a human being's repressive state from any other animal(s), is its consumption of the*past*. It is a superfluous element erected to counter any potential individual phenomenon and to configure the paralogy of*conscious rational memory*. It pushes a man's "steps as a dark, invisible burden…an imperfect tense, that can never become a perfect one (Nietzsche 61).

In this context, the functionalism of Kiran in the narrative is Dattani's search for an alternative. Is it really possible to construct human existence without*past* memory? Is the human consciousness can really transform from non-real to real?This search surfaced in the context of false analogies between Deepali and Sharad. Sharad, acting out Prakash in the

discourse, is providing justifications for possible reasons – leading to a break up with Kamlesh. The prominent absurd reason is his desire to change himself from homo to hetero – a detachment from his past (memory) and a continuation of *free will*. At this point she exclaims: "but, is that possible!" (Dattani 01:02:17-18), which is countered with a staunch denotative utterance from *now* Ed "of course it's possible" (Dattani 01:02: 19-20).However, the uncanny presence of heterosexual marriage soon provides the impetus – announcing nothing exists outside memory. Culture 'remembers' and by one way or the other it makes sure that its potential objects too, remember the constructs – whether in the form of ceremonial audio or through the presence of "dreadful children" (Dattani 00:15:13-14), dressed in their respective attires – the objects in circulation. The concrete memory of heterosexuality has been configured as a norm to produce more raw materials. It is being "strengthened by legislation, religious fiat, media imagery, and efforts at censorship" (Rich 29).Nothing escapes culture's panoptical presence; it must firmly establish what is just from what is unjust. It was thus imperative that the photograph- – the *realpleasure* of two human beings, must first be discovered not by the partakers, but by cultural products – the boy and the girl. The enclosed land must appeal to the children and in doing so they must be made aware of the right tools for constructing memory. The justification of their new semiotic discovery must therefore never come from the rogue subjects, dared to give expression to their inner-self; but from those neurotic objects, operating outside the closed periphery of the garden, who by suppressing or eliminating their primal desire(s), have identified with the structured norms. The stereotypical objects therefore erected the paradoxical temporality in which the characters "don't know what else to be" (Dattani 01:13:21-22). The thrust of objectification is so much so that any contrary standpoint will stumble upon inits presence. Ed's desire for identification with the *stereotypes*is neither based on any structure nor on cognition. He is an object still contradicting himself for being a cultural subject, something that "matter" (Dattani 01:16:22-23), and something that "no one will never know" (Dattani 01:11:04-05) – therefore when the situation demanded a confrontation with those forces to "look them in the eye and come back" (Dattani 01:15:49-50), he prostrated before the presence of an omnipotent force, something from which there is no escape.

The semiotic dimension of culture has, therefore, the endowment to enforce superficial laws; "the "subject" who emerges as a consequence of this repression becomes a bearer or proponent of repressive law" (Butler 107). The human*cognition,* however, is never evolved as a place where a continuous repression can take place – it is therefore, in a continuous search for an exterior discharge apparatus. The resultant equivalency in this context made the individual(s) a neurotic. Ranjit's drinking habit, Kamlesh's extensive drawings,Sharad's crockery obsession, Bunny Singh's continuous smiling, Prakash's*macho* two wheeler,are all the manifestations of such a defence mechanism(s). The characters' resultant homophobia towards a heterosexual norm is not thus conditioned by a discharge of inherent sexual

pleasure, but by a context ofconfigured memory sets. In doing so, they have inflicted more pain on themselves than culture possibly could; as Sharad has rightfully justified that in order to be a successful individual, one needs to construct their memory, their consciousness according to the erected value sets: "all it needs is a little bit of practise…never ever sit with your legs crossed…occupy as much room as you can…and walk as if you've got cricket bat between your legs…and what's a speech?...no flattery vowels" (Dattani 01:03:44-01:04:11). All that matters is the practice of*proper* value sets; to flood the prefrontal cortex and through repetitive practices, transform them into permanent *memories*. These value sets are

> not only the generators of new meanings, but also a condenser of cultural memory. It has the capacity to preserve the memory of its previous contexts. It is a metonymy of a reconstructed integral meaning, a discrete sign of a non-discrete essence. The meaning space itself enters into relationship with the cultural memory (tradition) already formed…the consciousness of the audience (Lotman 18).

The ambiguity of identification reached its apogee through Bunny Singh and Ed's confrontations. Bunny Singh, the self-proclaimed "liberal minded person"(Dattani 00:27:57-58) – successfully transformed himself into a cultural subject. A popular actor, acting as the representative of the 'ideal male' in "HamaraParivar"(Dattani 00:12:46-47), stands in isolation as Dattani's critic of media manipulation. What was structured as the purveyor of knowledge, media in the hands of culture has become the concealer of knowledge. The traditional assumption about *knowledge* was the justification by an individual, but in the hands of media, it has becomea mediated construct. It now circulates itself in the collective level and constructs the individual cognition; therefore individual memories "can only gain social relevance through media representation and distribution" (Erll 113). The constructivism of knowledge is thus functioning on use-value, and as Lyotard has observed: "knowledge is and will be produced in order to be sold; it is and will be consumed in order to be valorized in a new production" (31). This *valorization* has erected a panoptical system of absence presence. Being present at the level of audience perception, it can actively control the audience's cognition, but the absent gaze of a camera always haunts its performers. In an effort to conform to the decorum of civility, this often pushes the individual over the edge, – repressing their individuality to the level of perversion. As Bunny Singh has justified: "You can always have sex in the side"(Dattani 00:54:47-48), such a justification of a homosexual eros is the repressed memory under the camera. The camera mechanism in short is a

> "raw" historical document…more interesting is the illusion of filming… "They lived as if we(camera operators) were not there". An absurd, paradoxical formula – neither true, nor false: Utopian. There one sees what the real never was (but "as if you were there"), without the distance that gives us perspectival space and depth vision. Pleasure in the microcosmic simulation…it is the camera lens that like a

laser, comes to pierce lived reality in order to put it to death." (Baudrillard 27-28) Ed's newfound value sets are, therefore, an attempt to synthesize with the omnipotent structurality, to be identified with the "real man" (Dattani 01:01:47-48), away from the "den of …own little bubble"(Dattani 01:02:02-08). Such a search for catharsis is malleable since this is merely an alteration of signifiers – that is always evoked through "substitutions, transformations, and permutations…from a history of meaning…a history – whose origin may always be reawakened or whose end may always be anticipated in the form of presence" (Derrida 352-353).

Dattani's search "for another "syntax", another "grammar" of culture is crucial" (Irigaray 145), as the superimposed cultural normativity has transformed the individual cognitions into organless bodies – a price that the subjects have to pay for "living in India" (Dattani 00:20:15-16). His characters are strategically portrayed to voice their own unconscious. As Dattani has remarked in the preface of his play *On a Muggi Night in Mumbai*: "Every time audiences (critics too!) have applauded, laughed, cried or simply offered their silence in response to some moment in the play. I (Dattani) am completely aware that it is my character that has done the work for me". Therefore "the whole point is that Kamlesh has to exorcise his spirit" (Dattani 00:20:55-58), by destroying the photograph of his past memory – must appeal to the wider spectrum of society. The resultant aphasia or the characters' inability to voice their own libidinal desire(s) has morphed themselves into docile object(s) of ridicule.Their anatomy stands in complete antagonism from the culturally invested bodies; they are signified as "an imaginary dynasty of evils destined to be passed on for generations, it declared the furtive customs of the timid, and the most solitary of the pretty maniacs, dangerous for the whole society" (Foucault 53).

Conclusion : *Mango Soufflé* is a microcosmic representation of all the human schemata – all of its continuous repressions that go unnoticed for the sake of identification. Dattani's challenge towards the traditional Indian cinematography, his unveiling the unknown through the portrayal of the known has unearthed the contextual justifications between the culture and its products, ultimately contributing towards the construction of *memory*. The participatory aspect of civility demands from its performers a complete cognitive allegiance. In order to achieve its altruism(s), the characters are forced either to repress their memories or to flee from the country. Dattani's emphasis for new stomata, therefore, is the necessary pragmatics to re-stabilize the question of human existence – which can contribute towards a disturbance of the manifested norms, hitherto been responsible for controlling every paradigm of individual cognition.

Works Cited

Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation.*Translated by Sheila Faria Glaser, The University of Michigan, 1994.

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.*Routledge,

1990.

Dattani, Mahesh, director. *Mango Soufflé: A Not So Straight Movie*. Sanjeev Shah & Mahesh Dattani, 2002.

Dattani, Mahesh. *On a Muggi Night in Mumbai: a stage play*. Penguin Random House India, 2013.

Derrida, Jacques. *Writing and Difference.* Translated by Alan Brass, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978.

Erll, Astrid. *Memory in Culture.*Translated by Sara b. Young, Palgrave Macmillan, 2011.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality: An Introduction.*Translated by Robert Hurley, Vol. 1, Random House, INC., 1978.

Freud, Sigmund. "Hysteria".*The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Edited by James Strachey, vol. 1, The Hogarth Press, 1966, pp. 41-57

Irigaray, Luce. *This Sex Which is Not One*. Translated by Catherine Porter and Carolyn Burke, Cornell University Press, 1985.

Kumar, Sanjiv, and Prakash Bhadury. "The Marginalised Groups in Indian Social Construct : A Critical Study of Mahesh Dattani." *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences,* Vol. 0, no. 6, 2014, pp. 109-114.

Lotman, Yuri M. *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. Translated by Ann Shukman, Indiana University Press, 1990.

Lyotard, Jean-Francois.*The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Translated by Geoff Bennington and Brian Massum, University of Minnesota Press, 1984.

Nietzsche, Friedrich. *Untimely Meditations.*Translated by R.J. Hollingdale, Cambridge University Press, 1997.

Oommen, Susan. "Inventing Narratives, Arousing Audiences: the Plays of Mahesh Dattani". *New Theatre Quarterly*, Vol. 17, no. 4, 2009, pp. 347-356.

Rich, Adrienne. *Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985*. Norton & Company, 1994.

Wierzbicka, Anna. "Is "remember" a Universal Human Concept? "Memory" and Culture". *The Language of Memory in a Crosslinguistic Perspective,* edited by Mengistu Amberber, John Benjamins Publishing, 2007, pp. 13-40.

Manodip Chakraborty
Assistant Professor of English
TKR College of Engineering, Secunderabad

Defence and Strategic Studies in Colleges and Universities : Academic Indispensability

Subrata Ray

Abstract

Over a few decades, the arena of Defence Studies has evokedgreat importance since it makes the young individuals adequately capable of developing their career in the national security and national services of the nation. However, still the discipline has not developed to that extent to be a part of Indian education system and in many cases, colleges and universities have not been equipped enough to incorporate the discipline into academics. The paper aims to shed light on the indispensability of Defence and Strategic Studies in colleges and universities, specifically in strategic areas of the country.

Introduction

All subjects pertaining to the military and the instruction of soldiers and monarchs in the art of warfare are covered in the Introduction to Defence Studies in Ancient times. The definition of this module can be varied to include the defence strategies of nation, the art of war, and concerns for national security, as well as observations on military organisation and the importance of military education.All the local and international concerns that have an impact on defence or national security are covered by the area of "defence studies". This particular coursework aids candidates in obtaining the proper military instruction in two different historical and geographical contexts.In the coursework, the students are able to assist in creating holistic strategies for governments in an effort to deal with the issues as they become more aware of war and the difficulties it causes. Eventually, the students who have finished the programme work in the defence industry are strongly advised to dedicate all of their efforts and knowledge related to the Defence and National Security for the nation by joining military forces.Candidates who complete this programme are prepared to work as Defence Logistics Officers for the Ministry of Defence, which pays competitive pay. It is to be noted that a specialisation in defence science promotes the advancement of military training and raises public knowledge of concerns about national security.

Dates back to ancient times, India's desire for a battle, or "Dharma Yudh," remain constant. This indicates that the necessity of a battle is only raised for the sake of the realm. The essential value of the military code of conduct is discipline. The following list includes some of the warrior codes or laws that the ancient Indian army adhered to.

- A Kshatriya or a warrior wearing armour is not permitted to engage in combat with a non-armoured opponent.

Ray, Subrata : *Defence and Strategic Studies in Colleges and Universities : Academic Indispensability*
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 2, Dec 2022, Page : 51-61, ISSN 2249-4332

- Only one enemy can be engaged in combat at a time, and only then if the threat posed by that enemy has subsided the conflict to be ended.
- Men, women, and children are exempt from the encounter of military forces since the solders are required it remain and have no right to be killed by a warrior or soldier.

Considering the inextricable presence of wars in history, military studies were treated as one of the vital subjects in the most ancient education system of India which is also known as Gurukul. During those days, the students were not merely involved in learning various subjects like language, Vedas, mathematics, science and grammar, yet they also learnt the use of weapons and the art of warfare as integral parts of defence studies. Besides, leading a life under a strict routine makes them understand the value of discipline in daily life and defence simultaneously. Although the military study gained equal importance like other subjects, yet the form was unreservedly different. According to the military education system, it was mandatory for students to go through the practice of physical education comprising all activities of strength training like weight lifting, swimming, running. Additionally, the significance of practicing martial art is underlined for its potential to empower the soldiers with adequate fitness for defending against war. There were two categories of curriculum within military education. The soldiers were initially individually trained, and then the army was trained to fight as a military unit. Interestingly, camps for military training were established in almost every village in order to reinforce the villagers with appropriate proficiency in self-defence.

Although the system of military studies has changed with time, yet the United Kingdom is another country that embraces its history by leveraging the need for higher education of defence studies. Early in the 1950s, a community of influential individuals at the University of London, which include Lionel Robbins, Sir Charles Webster and Sir Keith Hancock, all renowned intellectuals who had contributed to the British war effort and written the history of that effort, concluded that military studies is required to be rehabilitated in the institution and its calibre improved in order to portray the holistic view of war, ranging economics, society, law, and ethics, among other topics. As quoted by Sir Michael Howard, “The history of war, I came to realise, was more than the operational history of armed forces, it was the study of entire societies. Only by studying their cultures could one come to understand what it was that they fought about and why they fought in the way that they did”. Being the Board of Military Studies’ representative at the University of London, Howard had already begun effectively running his independent department while also developing groups of students interested in “war and society,” including future historians Brian Bond and Peter Simkins in 1962.

Defence

The defence is a crucial component of combat since it entails a number of actions in order to impede the enemy’s onslaught. In other words, the study of defence portrays defence as an enactment of barricading international invaders and empowering nations with massive immunity. Considering this note, every nation is required to focus on developing a consolidated department of defence that provides them with a strong military force responsible for deterring war and

maintaining national security. In the time of defending, the soldiers are required to remain aware of the potential and actual hazards and vulnerabilities to the rights and freedoms of common people which are constantly fluctuating due to a variety of complex social, economic, military, and cultural elements, among others. Hence, this arena of national security seems to adhere to six significant principles that are articulated in the **DAMROD** framework. This acronym stands for, ***Depth***

Defence in depth is a defensive measure that aims to delay an attacking army instead of completely preventing it from moving forward.

All round defence

All-around defence is the discipline of arranging defensive resources so that military troops effectively defeat an attack from all sides, including the front, sides, and behind.Though maximum security arrangement depends on abundance of resources. Appropriate use and deployment of resources may also be fruitful for security and the participation of people. Particularly the interface between the academics. Common people and administrators may improve the situation and may provide more assurance from the academic point of view.

Mutual support

Mutual support makes a defence stronger by guaranteeing that any attack from one place will be met with "fire" from the other, forcing the enemy to concentrate their efforts elsewhere and decreasing the efficacy of their onslaught. Defence and strategic studies officially invite mutual relationship between people and academics and the more the relationship is assured better security is also expected.

Reserves

One of the most important concepts in both defensive and offensive military strategy is the reserve. By retaining an unaligned reserve, any military captain will have a force prepared to reinforce or repair any vulnerable points in the defensive zone as appropriate.

Offensive spirits

The expression "The best defence is a good offence" refers to the notion that a purposeful defensive approach will give the leader the opportunity to profit from counterattacks and make it more difficult for the opponent to launch pre-emptive strikes.

Deception

Deception is utilised in defence to hide the actual places of the forces and to deceive the enemy as under disguise and concealing, fatalities can be lessened and the opponent is made to spend effort and resources for minimal return.

The national defence is the state, specifically the overall conception of a State through which national security interests are established, planned, and propagated by the institutions possessing legitimately appropriate authority for this purpose. The importance of having strong armed forces and the need to protect people against various threats is a constant feature of

our national defence. The restoration of sovereignty, territorial integrity, independence, constitutional democracy, unity, and national interests throughout the whole process is guaranteed by the commitment of all resources that are obtainable during any given time when confronted with any kind of aggressive behavior, danger, security risk, uncertainty, or fight. Since the basic purpose of the national defence is to safeguard the overall population of a nation and the purposes of that state, it must be conducted using legitimate avenues. Thus, National security policies include a component on defence policy. By its fundamental essence, defence strategy is multidisciplinary that apparently incorporates all elements for strengthening a nation and advancing its security.

It is worth noting that an intense understanding of the principles and policies can be considered as a good testimony of well-trained and educated soldiers who are prudent to perform outstandingly in war against enemies; however, it requires the good practice of defence studies. A specialist audience, whose preferences and interests can be extended into numerous expressions of national security, is necessary for the study of Strategy and Defence as a subject. Along with the variety of topics comprising the study of peace and conflicts, the study of National Security, Economics, International relations, Along with other topics pertaining to the military or national security, this study of defence also addresses areas like military psychology and sociology. Currently, security is a notion that has grown in importance yet has been expanded beyond the perception of the average citizen of the nation. This can be attributed to a number of factors, including a broadening of the definition of "security" and a shift like warfare that is raising security issues in the neighbourhood of the nation.Raising awareness of this issue is hence essential and imperative in the modern scenario of national and international security. Many other terms, like defence and strategic studies, war and national security studies, military science, war and strategy studies and so forth are frequently used to refer to military research.

Strategy

Setting objectives and goals, choosing actions to accomplish the goals, and allocating resources to carry out the activities are all common components of strategy. In relation to the military theory, the concept of strategy can be better defined as an artistic tactic that engages defence leaders in organising the armed forces in such an effective manner in order to confidently secure the ultimate goals of politics and defence. However, it is undeniable that a good understanding of the military security study aces the development of foundation for the ways through which the armed forces are designated to be structured along with the identification of the nature of conflicts. Moreover, In addition to facilitating the development of a panel with a group of specialists for the administration of national security from a largely Indian standpoint yet with a holistic approach, it aids in developing the young generation's competence for rational review of strategic challenges. It provides a stable forum for constant discussion between military specialists, strategic theorists, and academicians in order to create a cross-

domain school of thought. On the matters of regional, national, and international security, the Division and its professors have proactively offered consulting services to federal advisory boards and strategic security. The Department also contributes to the Indian Armed Forces in a significant way, highlighting the value of defence studies in its scientific and academic research while actually serving in the service. The definition of strategy is the technique or idea of placing forces to migrate to a favourable position in a conflict. This indicates that warriors in armies must constantly be brainstorming new strategies to use against various opponents and rough terrain. Some of the ancient tactics are given in the following to better understand the strategic movement of military defence.

Leadership – Military leadership is a skill that must not be easily overlooked. It is more than a creative endeavour that depends on the courage, ability, and intellect of an individual.This serves as one of those significant elements that significantly affect battles.

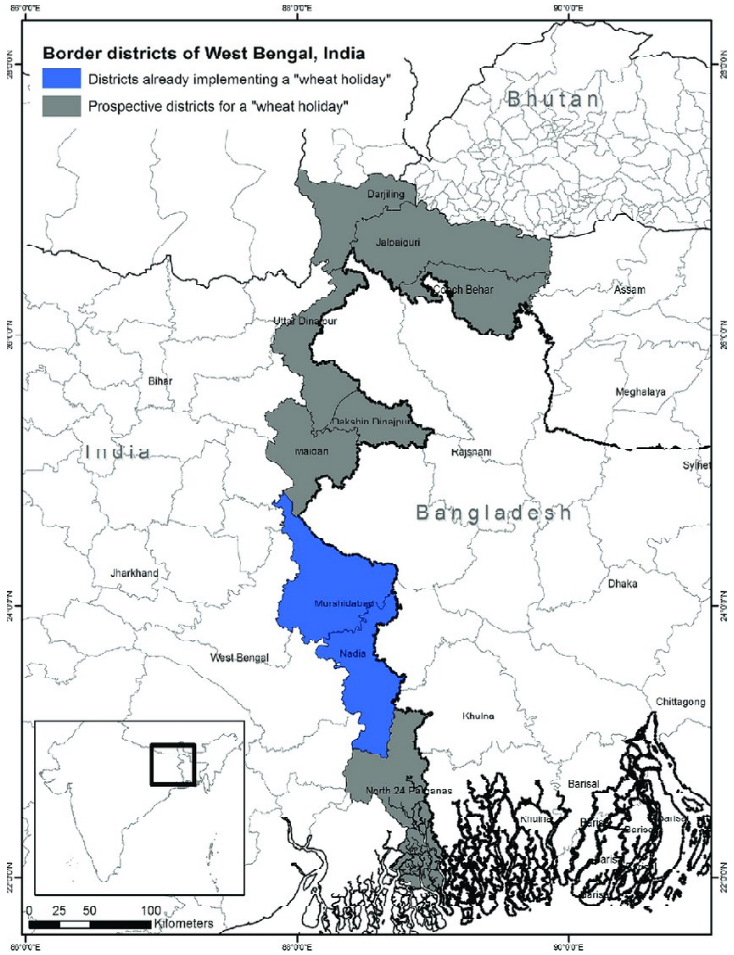

Source : https://www.researchgate.net/figure/Location-of-the-nine-border-districts-of-West-Bengal-India-grey-blue-Sources_fig1_331241666

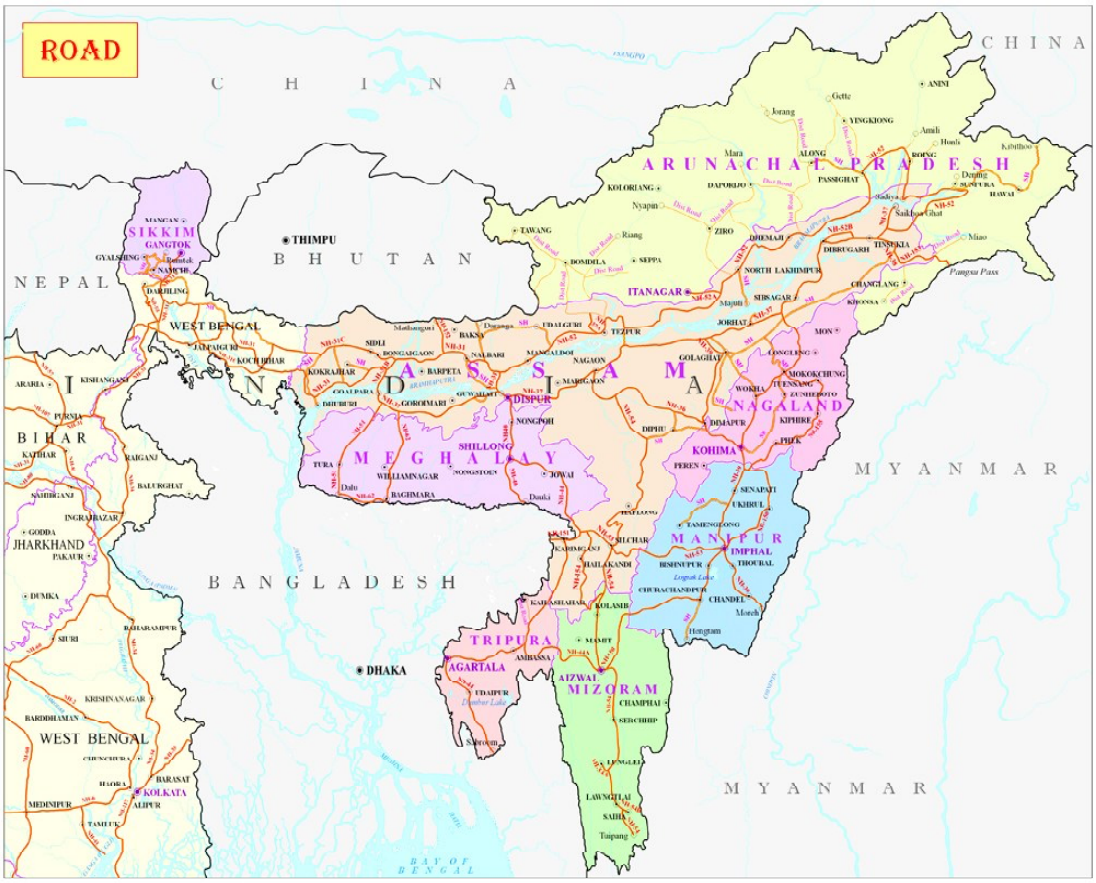

Source:Ministry of development of north eastern region, north east India.
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWQ9pF0gCj6CDtSDmGgx-b4KHKgGQ

Maps and Astronomy - These are necessary for travelling and traversing from one location to another. Since there were no maps in ancient times, the military soldiers used to travel from place to place by observing the direction of the sun and stars to determine their whereabouts. Since the *look east* policy propagation the strategic importance of West Bengal and other North Eastern states have been established for further analysis and this require detail studies on maps and astronomy for development of areas.

Logistics – During the wars, the armies are required to be well supplied with military necessities.To be more explicit on that issue, logistics remains crucial to winning a conflict because it is closely related to supply-related tasks.

Nevertheless, it is worth mentioning that officers or leaders of military forces are required to possess the ability of strategic thinking that can only be gained through the possession of good command over the knowledge pertaining to the defence and strategic studies. However, the syllabus and activities of the study also seek for the incorporation of a visionary strategy.

(a) Study of Military Organization - The Chaturangabala army, which included chariots, elephants, cavalry, and infantry, was first developed by ancient armies commencing with ground forces. In the past, the master had this military alliance in mind. As a crucial component of the defence studies that the ancient experts presented in the form of sports, the soldiers presently are taught the ways of using horses, elephants, and advanced weapons.Ancient times witnessed the inception of the study of defence groups that continues to be going from strength to strength nowadays. In fact, games like Chaturanga, Chess, wrestling and archery are also included in defence studies in order to make the soldiers competent in managing any critical or uncertain situations more tactfully.

Weapon skills

Ancient armies employed a wide range of weapons, which necessitates the appropriate training and thus, soldiers train using personal weapons on a daily basis in order to master weapon handling.Soldiers of this era were involved in studying the ways of manoeuvring a bow in a battle as long as the mastery of bows and arrows is believed to be among the key quintessential abilities for the-then soldiers. Additionally, a soldier requires the ability to ride and engage in horse-to-horse combat on the battlefield.

(b) National Security - Any country or nation must contend with enemies, environmental risks, natural calamities threats and more. In this case, understanding the different types of dangers and skillful mitigation techniques is crucial.Interestingly, the size of the military force and its organisational structure should be determined by a national security study in order to combat all adversaries.

(c) The Art of War - War is characterised as a struggle between two militaries. During the war, both of the nations are in need of deploying a wide range of strategies in order to ensure the victory in the battleground. For the purpose of prevailing against enemy forces, it is quintessential for the personnel of the army forces to be educated to employ a number of different plans and tactics.

(d) Military Curriculum- It is crucial to investigate the disciplines contained in the military program following the definition of the military science. The department if military defence seems to concentrate on the following areas considering them as the primary research areas for national and international security issues:

- National security
- Security issues in South Asia – traditional and non-traditional
- Arm control
- The problem of nuclear proliferation
- Conflict resolution

- Confidence-building measures
- International terrorism
- Economic management
- Legal aspects of international security
- Maritime Safety
- Environmental safety
- Other related fields

Peace

In the elimination of animosity and violence, peace is the idea of communal friendliness and tranquillity. Individuals are likely to abide by national standards of human rights and equity, value diverse cultures, appreciate the Earth and one another, and possess the ability to resolve disagreements and fight for justice without resorting to violence. Hence, peace serves as a crucial component in achieving the fulfilment of all human rights. To be specific to this perspective, the increment in the rate of protection, promotion and fulfilments of human rights in the society is an illustration of the decreased rate in the rise of violence and conflicts. Although fostering peace within a nation and also in a society is critical, yet some of the aspects such as the widespread repercussions of conflict, fragile military solutions against political problems and destructive nature of conflicts and sluggish development of a nation have made this facet significant in modern society. To assist people in facing and addressing the underlying causes and motivators of disputes and their aftereffects, concentrated effort over a medium to long period of time are required. In order for societies to be able to withstand shocks, handle conflicts, and respond to changes in their environments, there must be peace. In the absence of peace, it is unlikely to be feasible to achieve the sense of commitment, cooperation, and inclusivity necessary.

Present situation in Indian College and University

Although Defence science and Defence studies are often used as interchangeable terminology, yet they can easily be differentiated from each other on the basis of good understanding. In addition to studying battle, fighting, and the theory and use of organised coercive force, military science also analyses military organisations, processes, and behaviour, while on other hand, Defence studies are dependent on the interdisciplinary techniques due to its broader expansion in modern academics by articulating international terrorism, Military History, National security services more. While Defence science has long been successful in occupying a good position as an important subject in the Indian education system, Military Studies is still found to be currently taught barely in a handful of colleges or universities in India. Dr. A.N. Jha, the vice chancellor of the University of Allahabad at the time, spearheaded the move to add Defence Studies as a curriculum at the University in 1940. In 1965, the department began instructing

the topic at the levels of research and postgraduate. Apart from that, the University of Madras has become eminent for taking the initiative of offering the opportunity of distance learning in Defence and Strategic Studies to the interested students in 1981; however, this university seems to offer courses on the similar subjects at the levels of undergraduate, post-graduation, MPhil and PhD. Not only Allahabad and Chennai, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttarakhand are the states that also encourage the colleges and Universities to educate the students who are interested in Defence and Strategic Studies. DeenDayalUpadhyaya Gorakhpur University, at Gorakhpur in Uttar Pradesh, Guru Nanak College at Chennai, Bundelkhand University at Kanpur, and Dr.Ambedkar Arts College at Tamil Nadu also offers the scope of learning Defence and Strategic studies. In 2002, several schools in Maharashtra introduced the students with this subject at secondary levels. However, still the number of such colleges and Universities offering the opportunity of learning this subject at postgraduate levels are less in India in comparison with other countries in the world.

Present situation in the College and University in West Bengal

Considering the importance of Defence and Strategic Studies for accelerating the development of the nation, West Bengal is another state that has come forward to encourage a number of colleges and Universities to treat the education of Defence and Strategic studies as one of the major subjects. In West Bengal, some colleges that are affiliated under state Universities like the University of Calcutta, West Bengal State University atBarasat, University of Kalyani,and the University of Burdwan have been found for paying their major attention on the Study of Defence and strategy at undergraduate level. Despite being regarded as a crucial subject at a number of Indian institutions and universities, the subject of Defence and Strategic Studies has witnessed a severe failure instead of blooming due to lack of scope for achieving the degree of Honours at the under-graduation level. Moreover, the absence of opportunities for doing Masters or Post-graduation in the same field seems to create obstacles in conducting an extensive research as well. However, the root-causes of those problems are lying in the issue of unavailability of competent and efficient faculties who has the power of educating students with in-depth knowledge and understanding regarding the study of Defence and Strategic Studies.

Methodology

Since this study is engaged in analysing the importance of study in Defence and strategic Defence in colleges and Universities, the entire research extensively relies on the qualitative research method. In this due course, I have taken the help of various online sources for gathering adequate and updated information and conducting this specific research. The adequacy, validity and credibility of this study is thoroughly maintained throughout the research process since the availability of official websites of the above mentioned colleges and Universities as well as the coordination of the faculties associated with those colleges and Universities of

West Bengal and India throughout the interview process has helped me to derive authentic information that I have further incorporated into this study.

Conclusion

The analysis invites more opportunities to develop the scope and arouse academic and strategic interest for the study in Defence and Strategic studies in colleges and Universities. Defence studies should be taught to all the students of a country and thus, every school, college and University in India require to introduce this subject as a major one in the academic syllabus in order to meet the standard of the policy relevant with Defence studies. Besides, the opportunity of conducting plenty of researches still require concrete policy decision involving multidisciplinary studies which definitely include disciplines like, economics, international relations, history, psychology aswell as geography, diplomacy, environment, etc. An appropriate training program and integration of knowledge sharing process may be able to give rise to the community of competent teachers so that each student of India can possess a commendable knowledge over war, discipline, defence and military strategy as well.

Selected references

1. Tãtaru, I. (2011). The activities of the centre for defence and security strategic studies. *Strategic Impact*, 2011127.

From: https://cssas.unap.ro/en/pdf_periodicals/si38.pdf#page=141. Nairobi, Kenya.

2. Garnett, J. (2021). Strategic studies and its assumptions. In *Contemporary strategy* (pp. 3-21). Routledge.

From: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003104339-2/strategic-studies-assumptions-john-garnett. Milton Park, Abingdon-on-Thames, Oxfordshire United Kingdom.

3. National Defence University. Institute for National Strategic Studies. (1986). *Institute for National Strategic Studies*. National Defence University.

From:https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=O9QljvqEqgMC&oi=fnd&pg=PP3&dq=Importance+of+study+in+Defence+and+Strategic+Studies+ in+colleges+and+universities&ots=IfunqXXSBZ&sig=bFCgutMeN9Z0OiZFlIQBjshlyAU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

4. Brannick, T., & Coghlan, D. (2007). In Defence of being "native": The case for insider academic research. *Organizational research methods*, *10*(1), 59-74.

From:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094428106289253?journalCode=orma New Delhi, India.

5. Mukherjee, A. (2018). Educating the professional military: Civil–military relations and professional military education in India. *Armed Forces & Society*, *44*(3), 476-497.

From:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X17725863?journalCode=afsa New Delhi, India.

6. Chowdhury, A., & Mete, J. (2018). A Study on Peace Education in Purulia District in West Bengal. *J. Emerg. Technol. Innov. Res*, *5*.

From:https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81576863/JETIR1801081-libre.pdf?1646230797=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DA_Study_on_Peace_Education_in_Purulia_Di.pdf & Expires=1675500351&Signature=ZdTQAOjZBhuFE-VnOM-4QkCW8yM2-gSGPzUlrgq_UON2_SP58zS4A02ydQV-8s2-dYpqadjodfVdSSAvjsfgSzm8HljPlk1BNTDcdj6jBGjgK0O8No-avxWQ1-WLNqV5iiPpgoDki-oqVeDlc6cIhCnHO07JwE8tmPfflb3t6Ghgb B3E7~bxO4oxy~ cKiK3t6y7kbg8z QVvKwwr6j1NZDwQjoDYU4iTiD~F b2g4K6oCaB3W2wIM9ERSGEAcwDVCXt423W 3K7doU8bQlXI~GAjE2HzBKCDsU18BxFfLaICIgmWrCmE-RbiP0UPo-jIVgR81f4PykvRjB3pSNfLU-Oi6Iw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

7. Jhalani, M. K. (2010). *Deconstructing Motherhood: Indian Cultural Narratives and Ideology, 1970's Onwards*. SSS Publications.

From:https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=bYTqllgzQLUC&oi=fnd&pg=PR6&dq=Impo rtance+of+stu dy+in+Defence+and+Strategic+Studies+in+West+Bengal+colleges+and+ universities& ots=wwNm50r0FM&sig=zwAP0HRuI9W-h2oZhvmTWkErz6U&redir_esc=y#v= onepage&q&f= false Bengaluru, India.

8. Howorth, J. (2019). Differentiation in security and defence policy. *Comparative European Politics*, *17*, 261-277.

From: https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-019-00161-w New York City, United States.

9. Rynning, S. (2011). Realism and the common security and defence policy. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, *49*(1), 23-42.

From: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2010.02127.xHoboken, New Jersey.

Subrata Ray
Research Scholar,
Dept. of Defence and Strategic Studies,
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur.

A Study on National Education Policy 2020 : Future Education System

Aniruddha Saha
Ratna Garai

Abstract :
The National Education Policy (NEP) 2020 proposer to transform education. The NEP 2020 is a special stage of advancement in the education system. It focuses on the holistic development of students by ensuring access, relevance, equity, quality and strong foundational learning. The NEP also announces the formulation of a new and comprehensive National Curriculum Framework for School Education, NCFSE 2020-2021, which will be revisited and updated once in every 5 or 10 years.
Keywords: National Education Policy 2020, School Education, Higher Education, Implementation Strategy.

Introduction:
The education policy 2020 aims to restructure both school education and higher education in India. And they also renamed the union Ministry of Human Resource Development (MHRD) Ministry of Education, as proposed in NEP, to bring focus back on education and learning. This policy was submitted to K. Kasturirangan in May, 2019. New Education Policy was launched on Wednesday, July 29, 2020. Union Ministry for Information and Broadcasting **Prakash Javadekar** And Human Resource Development **Ramesh Pokhriyal Nishank,** made the announcement of the NEP-2020. NEP 2020 focus on Literature & Scientific Vocabulary of Indian Languages, strengthening National Institute for promotion of classical Languages & Literature.

Objectives of the Study:
The Objective of the Study on National Education Policy 2020 are:

- To Understand the Newly Pedagogical Structure of school Education.
- To Understand The Newly Accepted School Education.
- To Understand The Newly Accepted Higher Education.

Principles of NEP 2020:

- **Innovation in Diversity :**
  In all curriculum, Pedagogy, and Policy.
- **Neutrality :**
  Equity of all educational decision making.

- **Participation in social activities:**
  Encourage and facility for social activities.
- **Unique Capabilities:**
  Recognizing, Identifying them in each student.
- **Creative thinking:**
  To influence logical thinking & creative innovation.

Target of NEP 2020:

- ECCE for all by 2030
- Achieve 100% Gross Enrolment Ratio in school education by 2030.
- 50% Ger higher Education by 2035
- Teachers to be prepared for Assessment reforms by 2023.
- Inclusive & Equitable Education System by 2030.

Transforming Curricular & Pedagogical Structure:

Existing Academic Structure	New Academic Structure
	4 Years (Age 9 to 12)
2 Years (Age 16 to 18)	3 Years Class 6 to 8 (Age 11 to 14)
10 Years (Age 6 to 16)	3 Years Class 3 to 5 (Age 8 to 11)
	2 Years Class 1 & 2 (Age 6 to 8)
	3 Years Anganwadi/Pre-school/ Balvatika (Age 3 to 6)

OPEN EYES

New Pedagogical and Curricular Structure of School Education (5+3+3+4) :

- **Secondary Stage (4)** multidisciplinary study, greater critical thinking, flexibility and student choice of Subject
- **Middle Stage (3)** Experimental learning in the Sciences, Mathematics, Arts, Social Sciences, And Humanities.
- **Preparatory Stage (3)** Play, discovery, and activity- based and interactive classroom learning
- **Foundational Stage (5)** Multilevel, Play/ Activity – based learning.

Curriculum:

- Core Essentials
- Critical thinking
- Interactive classes
- Experiential learning
- Competency- based education
- Integration of subject
- Development of Scientific temper
- Focus on children with disability
- Reduce weight of school bags
- Health check up

Innovative Pedagogy:

- **Experiential Learning**
  Focus on experiential and story-telling and Discovery- based learing method

- **Integrated Pedagogy:**
  Arts , sports, Story- telling and ICT- integrated pedagogy

- **Equal Weightage:**
  No separation between curricular, co-curricular activities

- **Use of integration technology:**
  Integration of technology enabled pedagogy in classes 6- 12

School Education:

- **Bal Bhavan** : Art related, Careerer related, And Play relaed Activities
- **Samajik Chetna Kendras**: To promote Social, Intellectual, And Voluntary Activities.
- **Planning**
- **Health Check-up**

Teacher Education:

- **NPE 2020 Proposed New 4 Years Integrated B.ED**
  - B.ED degree for 1 year after completed post graduate.

- B.ED degree for 2 year after completed Under graduate
- B.ED degree for 4 year after completed Higher Secondary

- **New And Comprehensive National Curriculum Framework For Teacher Education by 2021**
- **National Higher Education Regulatory Council (NHERC)**, Function as single point regulator for Higher Education Sector including Teacher Education.

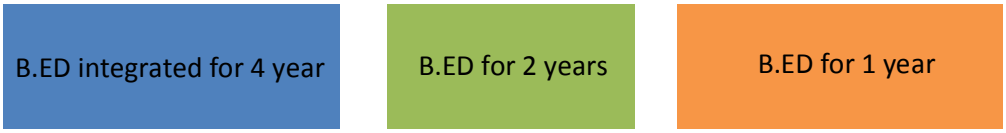

Teacher Recruitment and deployment:

- **Strengthening TETs,** For all Teachers across Foundational, Preparatory, Middle And Secondary Stage in Public School.
- Teach based planning for teacher recruitment

New Features in School Education:

- ECCE for all by 2030: NCF for ECCE
- Preparatory Class / Balvatika for 5-6 year olds
- National Foundational Literacy and Numeracy Mission
- School preparation module for all class 1 entrants
- Special Education Zones
- Gender Inclusion Fund; KGBVs upto class 12
- Reduction in curriculum to core concept
- Holistic Report card
- Medium of instruction mother tongue / local languages/ regional language at least upto grade 5
- National Assessment Centre – PARAKH
- Vocational education from middle stage
- Lok Vidya – local artistes as master instructors in school
- National professional Standards for Teachers by 2022
- Special provisions for Gifted children
- TEIs to move to multidisciplinary colleges and universities by2030
- Mandatory for every PhD student to do a module on teacher education
- School complex / clusters for resource

New features in Higher Education:

- HEIs will be transformed into large multidisciplinary universities, college, and HEIs clusters / knowledge hubs.
- Undergraduate degree either 3 or 4- year duration multiple exist option.
- 4 year multidisciplinary Bachelor's programme
- Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs) will be set up.

OPEN EYES

- Making institution autonomous.
- Professional academic and career counselling
- Industrialization of education will allow entry of foreign universities, learner Financial support for students- National Scholarship portal expanded
- Professional education integral part of the higher education.
- Stand- alone technical Universities, health science universities, legal and agricultural universities, aim to become multi- disciplinary Institution.
- National Institute for Pali, Persian, and Prakrit will be set up
- All education Institutions will be held to similar standard of audit and disclosure.
- Effort to preserve and promote all Indian languages including classical, tribal, and endangered languages will be undertaken
- Indian Institution of translation and Interpretation to be established
- Central advisory Board of education will be strengthened, remodelled and rejuvenated for developing, articulating, evaluating and revising the vision of education.

Centre of Performance Assessment:

Create National Centre For, **Performance Assessment Review And Analysis of Knowledge for Holistic Development (PARAKH)**

- Objectives of PARAKH
  - Setting Norms, Standard And Guidelines For Assessment And Evaluation.
  - Conducting State And National Achievement Survey.
  - Monitoring Achievement of Learning Outcome in the Country.

Indian Culture, language, and Values:

- Study to Literature & Scientific vocabulary of Indian Languages
- Language Faculty
- Research on Languages
- Cultural awareness of our Indian Knowledge Systems
- Promoting Traditional Arts / Lok Vidya

Use of Technology:

- **Use of technology in -**
  Education Planning
  Teaching, learning & Assessment
  Administration & Management
- Virtual Labs
- National Education Technology Forum (NEFT)
- Digitally Equipping Schools, Teachers Ad Students

Conclusion:

The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21 century and aims to address the many growing development imperatives of our country. The new education policy

emphasizes discovery learning, learning by doing that will help the learner to make independent. The new education policy must help re-establish teachers, at all levels, as the most respected and essential members of our society. NEP 2020 is moving towards to achieve 100% literacy in India by improving quality of Indian education.

References:

- *National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2020.*
- *Mahmut, Ö. Z. E. R. (2020). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 pandemic in Turkey. Kastamonu Eðitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.*
- *Wajdi, M. B. N., Kuswandi, I., Al Faruq, U., Zulhijra, Z., Khairudin, K., & Khoiriyah, K. (2020). Education policy overcome coronavirus, a study of Indonesians. EDUTEC: Journal of Education And Technology, 3(2), 96-106.*
- Fuhrman, S. H., Cohen, D. K., & Mosher, F. (Eds.). (2020). *The state of education policy research.* Routledge.
- *Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2021). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public affairs, 21(3), e2500.*
- *Neuman, M. J. (2020). Governance of early childhood education and care: Recent developments in OECD countries. The Routledge reader in early childhood education, 163-176.*

Aniruddha Saha
Assistant Professor
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

&

Ratna Garai
M. Phil Research Scholar
Department of Education
Diamond Harbour Women's University

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 19, No. 2, December 2022

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only